ধৃতং প্রেম

বিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্ণা

(বিংশ খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১ বাংলা)

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূল্য Rs 07.00 [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার

প্রকাশক ঃ— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম।

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

[1965]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

অযাচক আশ্রম,

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১,

উত্তরপ্রদেশ।

কলিকাতার নিম্নলিখিত লাইব্রেরীসমূহে ঃ—

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

৪। হিন্দুস্থান লাইব্রেরী, ৫৪।৯, কলেজ ষ্ট্রীট,

৫। তারা লাইব্রেরী, ১০৫, আপার চিৎপুর রোড,

৬। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী

দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

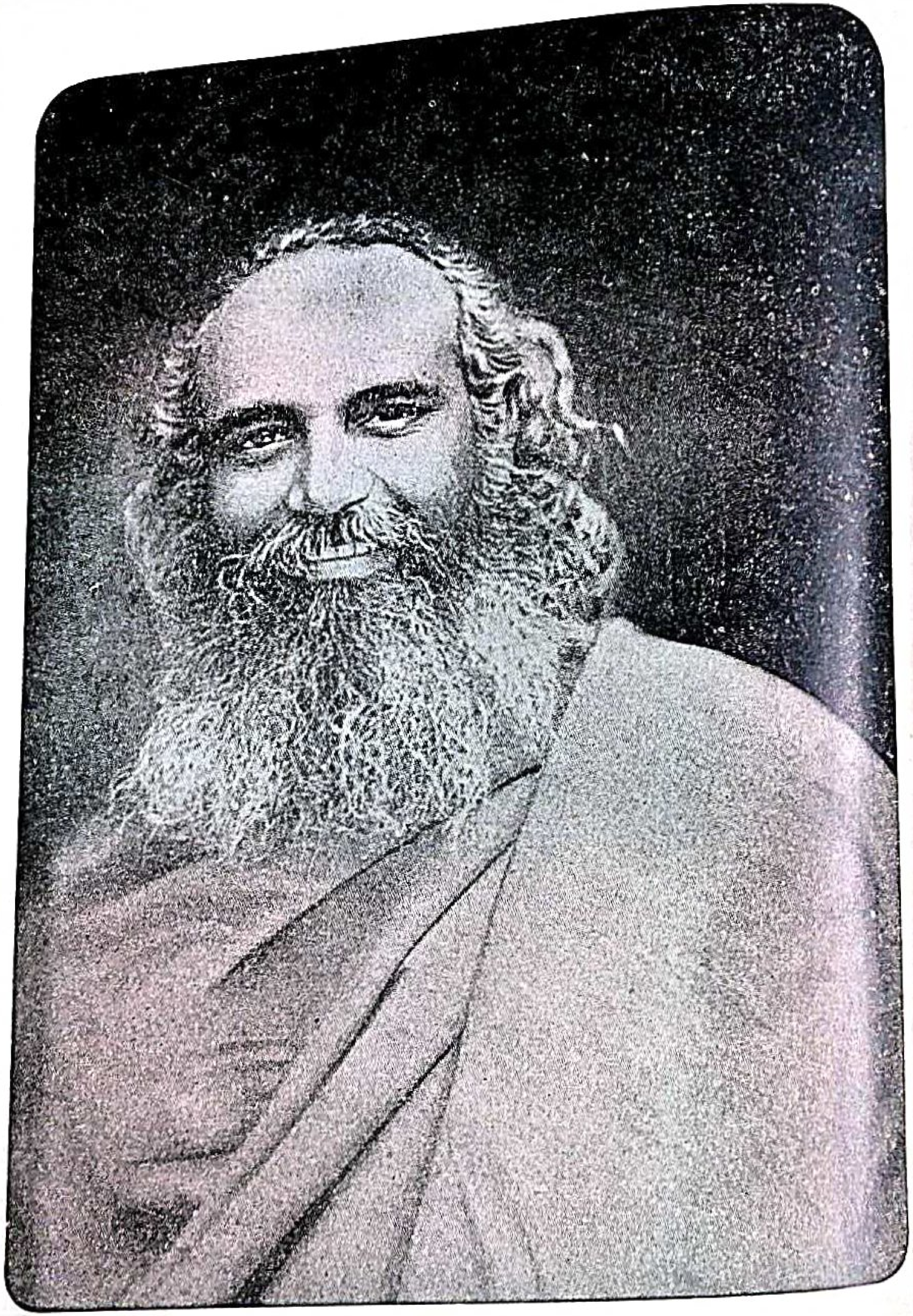
ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

বিংশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭১ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার বিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে উনবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি।

বৈশাখ, ১৩৭২ বাংলা।

অযাচক আশ্রম	বিনীত
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,	ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
বারাণসী-১	ব্রহ্মচারী স্নেহময়



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

ধৃতং প্রেম্ণা

(বিংশ খণ্ড)

(১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লিখিয়াছ, স্বল্প সময়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের শ্রমসাধ্য কার্য্য আমি কি কৌশলে সমাপন করি। কৌশলটা বলিব। আমি কর্ম্মকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানি। ছোট কাজ আর বড় কাজ আমার চোখে সমান জরুরী এবং সমান আদরণীয়। যাহা পাই, তাহাই অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা নিয়া করি। এই জন্যই কাজে ক্লান্তি আসে না। ক্লান্তি না আসিলে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে কষ্ট কোথায়?

বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্ম একই সঙ্গে করিয়া যাওয়াও কঠিন নহে। নানা কর্ম্মের নানা বিচিত্রতার মধ্যেও উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া প্রত্যেকটীর একটী ধ্রুব লক্ষ্য আছে। প্রতি কার্য্যেরই লক্ষ্য এক হইলে কাজগুলি

বিভিন্ন ঢংয়ের বা বিরুদ্ধ প্রকৃতির হইলেও তাহাদের মধ্যে সৌহৃদ্যের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া লওয়া সম্ভব। কর্ম্মই আমার নিকটে ব্রহ্ম বলিয়া বিচিত্র বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্যে সম্বন্ধের সুশৃঙ্খলা আমার প্রজ্ঞায় ধরা পড়ে। এই জন্যই দুদিন পরে দেখা যায় যে একই সঙ্গে বিভিন্নমুখী অনেকগুলি কর্ম্মে হাত দিলেও একটার পর একটা আপনাআপনি এক বোধগম্য রূপরেখায় ধরা পড়িয়াছে।

এগুলি আমি ইচ্ছা করিয়া করি না। আপনাআপনি হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

বারাণসী

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে তোমাকে এক পত্র লিখিয়াছি। মনে হইল, তাহা পাও নাই। তোমার দ্বিতীয় পত্র কাল পাইয়াছি। আমি আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি যে, সংসারে থাকিতে হইলে স্বামী ও স্ত্রী যদি তাহাদের নিজ নিজ অধিকারের দাবী নিয়াই কলহ করিতে থাকে, তাহা হইলে শান্তির আশা দুরূহ। একথা সত্য যে, বিবাহ হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীটা স্বামীর দাসী বা স্বামীটী স্ত্রীর কিঙ্করে পরিণত হয় না, উভয়ের এক একটা স্বাধীন সত্তা আছে এবং তাহার সম্মান রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু যেখানে স্নেহ আছে, প্রেম আছে, আকর্ষণ আছে, অনুরাগ আছে, সেখানে স্বামী বা স্ত্রী কাহারও মনেই এই সকল অধিকারগত প্রশ্ন জাগে না। স্বামিস্ত্রীর জীবনটা মূলতঃ একটা কন্ট্রাক্ট্ বা চুক্তির জীবন নহে, মূলতঃ ইহা প্রেমের জীবন এবং প্রেম যেখানে আছে, সেখানে আমার অধিকার ইহা, তোমার অধিকার উহা, এই জাতীয় যুক্তি বা বিচারের অবকাশ থাকে না। মুখ্যত দাম্পত্য জীবন একটা মোহময়, সুখময়, প্রীতিময় জীবন, যেখানে ভালবাসার দায়ে একে অন্যের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ত্রুটি আর নগণ্য অপরাধ অবহেলে উপেক্ষা করিবে এবং একের বিরুদ্ধে অপরের অপরাধ করিবার ক্ষমতা স্বভাবতই স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

স্বামীকে বশ করার উপায় স্বামীর উপরে তম্বিতাম্বি করা নয়, যাহাতে স্বামীর মন স্ত্রীর প্রতি গভীর ভাবে সর্ব্বদাই আকৃষ্ট থাকে, তাহার জন্য স্ত্রীরও একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। তুমি নারী, কেবল এই দরুণই স্বামী তোমার প্রতি আকৃষ্ট থাকিবেন, এইরূপ আশা করা অন্যায়। আরও ত কত নারী জগৎ জুড়িয়া ছড়াইয়া আছে, নারীত্বের দৌলতে তাহারাও ত তোমার স্বামীকে আকর্ষণ করিবার দাবী করিতে পারে। তুমি বিবাহিতা পত্নী, কেবল এই দরুণই তোমার স্বামী তোমাতে আকৃষ্ট থাকিবেন, এইরূপ আশা করাও ভুল। বিবাহের কালে তোমার ভিতরে যে নূতনত্ব ছিল, এখনো কি তাহাই আছে? মানুষ ত নূতনত্ব দেখিয়াই আকৃষ্ট হয়। পুরাতনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ, তাহার কারণও ত ঐ পুরাতনত্বের ভিতরে কিছু শাশ্বত নূতনত্ব লুকাইয়া থাকে বলিয়া। তোমাকে চিরনূতন থাকিতে হইবে। স্বার্থের দাবীহীন নিষ্কলুষ প্রেম এবং প্রতিদান-লোভহীন সুবিনীত সেবা দিয়া তুমি নিত্য নূতন হইবে। স্বামি-সোহাগিনী হইবার ইহাই পথ।

দুর্জ্জয় অভিমান পরিহার কর। অভিমান প্রেমের শত্রু। দাবীর ভাব বর্জ্জন কর। দাবী-দাওয়া প্রভুত্বের লক্ষণ, প্রেমের নহে। প্রেম কিসে আসে, তাহা দেখ। প্রেমেই শান্তি, প্রেমেই মিলন। প্রেম তোমাদের জাগুক এবং সেই প্রেম অক্ষয় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

বারাণসী

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

নারায়ণেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যেখানে একটী মণ্ডলী স্থাপন করিবে, সেখানেই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে নিয়মিত সমবেত উপাসনা, গৃহে গৃহে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ ও হরিওঁ-কীর্ত্তন প্রচলিত করা। একাজ বেশ দানা বাঁধিবার পরেই মণ্ডলীর পরিচালনে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিবে। আস্তে আস্তে যাহাতে এ বিদ্যালয় মাধ্যমিকে উন্নীত হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়া ঝগড়া-কলহ ও অনুচিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা না থাকিলে দেখিবে, এই মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখিতে না দেখিতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

ইহা কাল্পনিক ধারণা নহে, বাস্তব সত্য। ডিব্রুগড় বড়বাড়ী রেল-কলোনির অখণ্ডমণ্ডলী সত্য সত্যই ইহা করিয়াছেন। এবার তাঁহাদের

মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চ-বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। এখন যদি আদর্শনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটী ছাত্র-ছাত্রী ভাবী ভারতের মূল্যবান নাগরিকে পরিণত হইতে পারিবে। লক্ষ্য থাকুক তোমাদের ভবিষ্যতের দিকে।

ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের গঠন এবং মানসিক প্রবণতাগুলির শ্রেয়ঃপথে বিকশন হইবে বিদ্যালয়ের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না।

আমার এই পত্রখানার নকল ভারতের প্রত্যেক অখণ্ড-মণ্ডলীতে প্রেরণ কর। কেবল আধ্যাত্মিক চর্চ্চাই নহে, সামাজিক কুশলপ্রদ কর্ম্ম-গুলিও মণ্ডলীগুলির ভিতর দিয়া প্রকটিত হওয়া চাই। চিরকাল তোমরা মুকুলেই শুকাইতে থাকিও না, ফুটিতেও হইবে, সর্ব্বজীবেশ্বরের পূজায় লাগিতেও হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

বারাণসী

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কন্যা বিবাহ দিবার জন্য পাত্র পাইয়াছ এবং পাত্রটী সকল

রকমেই তোমাদের পছন্দ হইয়াছে, কেবল ছেলেটী বংশে একটু খাটো, এজন্য মনে দ্বিধা আসিয়াছে বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছ।

কিন্তু ছেলেটী অন্য সকল প্রকারে তোমাদের মনঃপূত হইয়াছে ত? বেশ, তাহা হইলেই হইল। ছেলে বা মেয়ে পছন্দ হইয়া গেলে এবং সেই পছন্দটী ছেলে ও মেয়ের পিতামাতারা করিলে শুধু একটু বংশের ছোট-বড় নিয়া দ্বিধা রাখা উচিত নহে। বিবাহযোগ্যা কন্যা সুপাত্র পাইলেই দিবে। রত্নস্বরূপা কন্যা নীচ কুলে পাইলেও নিবে। এই নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, চিরকাল চলিবে।

তবে পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান যদি এত বেশী হয় যে, বিবাহটী হইবার পরে দুই বংশের লোকদের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক কুটুম্বিতা ও আত্মীয়তার আদান-প্রদান চলিবে না, তাহা হইলে হয় ছেলেটী একঘরে হইয়া গেল, নয় মেয়েটী হইয়া রহিল নির্ব্বাসিতা। ইহার একটা দারুণ মনস্তাত্ত্বিক কুফল আছে আর এই অবস্থায় জাত পুত্রকন্যারা কতকগুলি জন্মজাত ক্রোধ লইয়াই বড় হইতে থাকে, তাহারা কালাপাহাড় হয়, তাহারা স্বাভাবিক যুক্তির পথে বিচার না চালাইয়া অস্বাভাবিক কতকগুলি অতিরঞ্জিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সমাজের কাঠামোর উপরে আঘাত হানিবার জন্য দুর্ম্মদ আক্রমণ চালাইতে থাকে। যে স্থলে বিবাহ দুইটী বংশকে এক করিবে, সে স্থলে এই সকল বিবাহ একটী বংশের সহিত বহু বংশের বৈরভাব সৃষ্টি করে।

বিবাহের একটা শারীরিক দিক আছে, যাহার ফল পাইবে পুত্র-কন্যারা। বিবাহের একটা মানসিক দিক আছে, যাহার ফলে দম্পতী সুখী হইবে বা দুঃখ কুড়াইবে। বিবাহের একটা সামাজিক দিক আছে, যাহা দ্বারা সমাজের শক্তি বাড়িবে, গৌরব বাড়িবে। যে যেখানে ইচ্ছা

বিবাহ করুক কিন্তু এই তিনটী দিকে সাধ্যমত নজর রাখিয়া কাজ করিলে সে সর্ব্বজনের কুশলের ভাণ্ডারে অকৃপণ হস্তে দান করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আইন কি দিতে পারে? দিতে পারে অধিকার। মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবাহিতা ভগিনীকে পিতার সম্পত্তির উপরে অধিকার সম্প্রতি আইনে দিয়াছে। ভগিনী কণা মাত্র চিন্তা করিল না যে এই অধিকারের দাবী নিয়া সে অগ্রসর হইলে ভ্রাতার কত বড় সঙ্কট হইতে পারে। ভ্রাতাকে যতদূর পারে নাস্তানাবুদ নাজেহাল সে করিল। আজ পতিবিয়োগের পরে সে হইল অনাথিনী। আবার ঐ দরিদ্র ও উৎপীড়িত ভ্রাতারই গলগ্রহ তাহাকে হইতে হইবে। অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিহাস।

সমস্ত ঘটনাই আমি জানি। আমাকে আর পূর্ব্ব ইতিহাসের বর্ণনা পাঠাইতে হইবে না। ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীনা আত্মস্বার্থপরায়ণা এই দুরন্ত-

চরিত্রা ভগিনীর বিপদের দিনে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। ভগিনী আইন দেখিয়াছিল, তুমি দেখিও মনুষ্যত্ব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

বারাণসী
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি হরিওঁ কীর্ত্তন কর আর তোমাদের গ্রামের স্বামীজী মহারাজেরা ইহা পছন্দ করেন না শুনিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইলাম। হর্ষ এই জন্য যে একদিন ইঁহারাই হরিওঁ নামকীর্ত্তনকে আমার চেয়েও বেশী পছন্দ করিবেন, বিষাদ এই জন্য যে ইঁহারা জ্ঞানী গুণী মহাজন হইয়াও হরিওঁ নামের মহিমা বুঝিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, তুমি এই ব্যাপার নিয়া মনকে আন্দোলিত হইতে দিও না এবং অপরদের নিজ নিজ উপাসনারীতি ও সাধন-ভজনের প্রণালীতে কোনও বাধাদান বা বিঘ্ন-সৃষ্টি না করিয়া অপ্রতিহত বিক্রমে নিজের কীর্ত্তন করিয়া যাইতে থাক।

এমনও কি হইতে পারে না যে, তুমি যাঁহাদিগকে হরিওঁ কীর্ত্তনের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেছ, মনে মনে তাঁহারা অনুরাগী। কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিও।

"হরি" শব্দের মানে পরমেশ্বর আর "ওঁ" শব্দের মানে "হাঁ"। "হরিওঁ" কথার মানে দাঁড়ায় "ঈশ্বর আছেন।" জগতে কোন্ ধার্ম্মিক

ব্যক্তি আছেন, যিনি এমন চমৎকার কথায় আপত্তি তুলিবেন? অধার্ম্মিক, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু আস্তিকের পক্ষে "হরিওঁ" কথায় আপত্তি করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। যাঁহারা স্ত্রীশূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই সকল সরলচেতা সনাতনী সজ্জনদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ওকালতী করেন, ব্রাহ্মণের সৃষ্ট পৌরহিত্যতন্ত্রের দাসত্ব হইতে সমাজ ও জাতিকে মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা নিজেদিগকে মনে করেন, তাঁহারা আপত্তি করিবেন কোন্ যুক্তিতে? আমার মনে হয়, স্বামীজী মহারাজদের প্রকৃত মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে তোমার হয় ত ভুল হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, নিজের কাজ নিজে করিয়া যাও। অন্যের ভালমন্দে থাকিও না। যাঁহারা বিরোধী, তাঁহাদের প্রতি প্রেমহীনও হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

বারাণসী
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অনেক স্থান হইতে পত্র পাই

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

যে সমবেত উপাসনাতে লোক হয় না আর তুমি সংবাদ দিয়াছ যে প্রতিটি সমবেত উপাসনাতে আশাতীত জন-সমাগম হইতেছে। এমন কি যাঁহারা তোমাদের গুরুভাই নহেন, এমন ব্যক্তিরাও ভক্তিভরে যোগদান করিতেছেন।

ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। আমাদের সমবেত উপাসনা বিশ্বজনীন অনুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নহে। আমার শিষ্যগণ আমার নিকটে ইহা শিখিয়াছে, এই যুক্তিতে ইহা আমার পূজা-প্রবর্ত্তনের একটা কৌশল নহে, ইহা বিশ্বজনের বিশ্বপ্রভুর বিশ্বতোমুখ অর্চ্চনার আয়োজন। এই জন্যই, তোমরা নিজেরা যদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক সমবেত উপাসনাতে যোগদান কর এবং ভক্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠানটীর সহিত একাত্ম হও, তাহা হইলে প্রতিবেশীদের সাধ্য নাই যে, ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। তোমরা তোমাদের এই সুমহৎ অনুষ্ঠানের মহিমা অনেকে জান না বলিয়াই অনেক স্থানে ইহাতে অবহেলা করিয়া আসিয়াছ।

দিগন্তবিস্তৃত দুস্তর মরুভূমির ধূ-ধূ বালুকারাশির মধ্যে মরুকুঞ্জ যেমন তার দুদশটী খর্জ্জুর-তরু দিয়াই পরম রমণীয়, অনেকগুলি মণ্ডলীর পরম-রসহীন নিরনুরাগ ঔদাসীন্যের মাঝখানে তোমাদের মণ্ডলীর সমবেত উপাসনার সফলতা তেমনই চিত্তপ্রসাদসঞ্চারিণী। তোমাদের দৃষ্টান্ত অপর সকল স্থানে অনুসৃত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

তুমি নিজেকে সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছ, বেশ করিয়াছ। বিনয় চরিত্রের অলঙ্কার মাত্রই নহে, ইহা চরিত্রের বল। কিন্তু জগতে

সাধারণ ব্যক্তিরাও যে অসাধারণ কাজ করিতে পারে, এই বিশ্বাস রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ বারাণসী
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা— ; প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি কতকগুলি দায়িত্বপূর্ণ জনসেবামূলক কাজের ভার পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। নিষ্কাম অন্তরে কাজ করিয়া জীবন ধন্য কর।

স্ত্রীকে কথগঘ বা কাব্য, নাটক আর ব্যাকরণ পড়ানোর নামই শিক্ষিতা করা নহে। তাহাকে আমাদের উন্নত আদর্শগুলির সহিত পরিচিত কর। স্বাধ্যায়ের ফলে ইহা সম্ভব হইবে। অখণ্ড-সংহিতা তোমাদের স্বাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এ কাজ করিয়া দেখ, কত দ্রুত কত অপ্রত্যাশিত ফল লাভ হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ
দানাপুর
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সারাদিন কীর্ত্তন করিয়া শরীর খারাপ করিয়া আসিলে। এমন কীর্ত্তন না করিলে কি হইত? এখন যে কুড়ি দিন ধরিয়া শয্যায় পড়িয়া কর্ম্মে অক্ষম হইয়া রহিয়াছ, ইহা কোন্ কাজে আসিবে? আমি ধর্ম্মের নাম করিয়াও শরীরের উপরে অত্যাচার করিতে তোমাদের বারণ করিয়াছি এই জন্য যে, এই শরীরকে আমৃত্যু জগতের সেবায়, ভগবানের কাজে, দশের দেশের কল্যাণকর্ম্মে নিয়ত নিয়োজিত রাখিতে হইবে। শরীর তোমার হাতে ভগবানের গচ্ছিত সম্পত্তি। ইহা তুমি হেলায় নষ্ট করিতে পার না। ইহা অনাদরের বস্তু নহে। দু-তিন ঘণ্টা কীর্ত্তন করিয়াই যখন জ্বর উঠিয়া গেল, তখন চলিয়া আসিলেই হইত। সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া আর ক্লেশ করিয়া কীর্ত্তন করিবার জরুরী প্রয়োজন কিছু ছিল না। তবে, ভগবানের নাম করিতে করিতে অসুস্থ হইয়াছ, ভগবানের নাম করিতে করিতেই সুস্থ হইবে। নাম ভুলিও না। অন্য লোককে সুস্থ শরীরেও ভগবানের নামকীর্ত্তনে ডাকিয়া আনা যায় না, তাহাদের নাকি কাজের অন্ত নাই, আসল কথা তাহারা নামে রুচি পায় না। তোমার হাজার কাজ থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ শরীর নিয়া তুমি নামকীর্ত্তনের আহ্বানকে সসম্মান মর্য্যাদা দিয়াছ, তোমার এই নিষ্ঠা, ভক্তি ও সদ্রুচি আমাকে আনন্দ দিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নামে রুচি, জীবে দয়া দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হউক।

জীবনটাকে যতটুকু পার, সৎকাজে লাগাও। সৎকাজ হাজার রকমের আছে। যাহার পক্ষে যে সৎকাজটী সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে সম্পাদন সম্ভব, সে আগে সেই কাজটী কর। যাহারা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সৎকর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের প্রতিজনের কাজকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখ এবং অপরের সদ্দৃষ্টান্ত হইতে যেখান দিয়া যে সৎপ্রেরণাটুকু সংগ্রহ সম্ভব, তাহা কুড়াইয়া লও। ছোট ছোট সৎকাজ যাহারা করিতেছে, তাহাদিগকেও মহৎ এবং বরণীয় বলিয়া জ্ঞান কর। সকলের ভিতরের সদ্‌গুণগুলির অনুসরণ কর।

ঈশ্বর-চিন্তন সকল সৎকাজের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঈশ্বর-চিন্তন করিবে বলিয়া অন্য সৎকাজ ছাড়িয়া দিবে, তাহা নহে। কর্ম্মের এমন অভ্যাস আয়ত্ত কর যেন, ধ্যানস্থ হইয়া, সমাধি-নিবিষ্ট থাকিয়াও প্রচণ্ড আলোড়নে কর্ম্মের ঝঞ্ঝা চালাইতে পার। ধ্যানের এমন অভ্যাস কর যেন, কর্ম্মের চূড়ান্ত আন্দোলনের মাঝেও নিজেকে সমাধিস্থ রাখিতে পার। উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত জাগতিক প্রয়োজনীয় কর্ম্মকে একসঙ্গে চালাইয়া নিবার যোগ তোমরা আয়ত্ত কর।

অনেককেই বলিতে শুনি, বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করিলে অন্তর্ম্মুখ সাধনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কথাটা এক হিসাবে সত্য। কর্ম্ম যখন বাহিরে, মনও যদি তখন বাহিরেই পড়িয়া থাকে, তবে ক্ষতি ত হইবেই। কিন্তু এমন অভ্যাস তোমাদের করিতে হইবে যেন, হাত-পা-চোখ-নাক-কান বাহিরের কাজ করিলেও মন তার অন্তরঙ্গ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমাধিস্থের কর্ম্ম আর কর্ম্মরতের সমাধি একটা নূতন কথা হইতে পারে কিন্তু ইহা কল্পনাও নহে, নূতন সত্যও নহে। ইহা বাস্তব এবং অতি পুরাতন এক শাশ্বত সত্য। সেই সত্য দুই চারিটি জীবনে বা দুই চারিটী

সুদুর্লভ সুক্ষণে আস্বাদিত হইয়াছে, এই মাত্র। যাহা দুই চারিটী জীবনে হইয়াছে, তাহা দশ-বিশ লক্ষ জীবনেও সত্য হইতে পারে। যাহা দুই-চারি ক্ষণের জন্য হইয়াছে, তাহা সমগ্র জীবনব্যাপীও হইতে পারে। ইহা অযৌক্তিক বাক্য নহে, অসম্ভব উক্তি নহে।

ধর্ম্ম এবং আড়ম্বর এক জিনিষ নয়। ধর্ম্ম হইতে আড়ম্বরকে বাদ দিলে লোক-সংগ্রহের দিক্ দিয়া ক্ষতি হইতে পারে, অন্য ক্ষতি অধিক নাই। কোনও কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মানুরাগ বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া প্রথম উদ্রিক্ত হয়, এই হিসাবে আড়ম্বরের একটা উপযোগিতা আছে। কিন্তু ধর্ম্ম যখন আড়ম্বর-প্রধান হয়, তখন প্রকৃত ধর্ম্ম একান্তই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং কুণ্ঠিত মনে যবনিকার অন্তরালে গিয়া দাঁড়ায়। এজন্য আমি তোমাদিগকে অত্যধিক আড়ম্বর হইতে দূরে থাকিতে বলিয়া থাকি।

অধিকাংশ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কতকাংশ আড়ম্বর, কতকাংশ নিভৃত উপলব্ধির আগ্রহ-সৃজনের ভূমিকা, কিছুটা অন্তরঙ্গ বস্তু। এগুলির একটা হইতে অপরটাকে আলাদা করিয়া লওয়া অনেক সময়ে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশ সম্পাদন-কালে অন্তরের ভক্তিস্রোতকে অব্যাহত রাখা আবশ্যক। ভক্তি থাকিলে ভান আসে না, অহঙ্কার আসে না। সুতরাং ধর্ম্মচ্যুতিও ঘটে না।

পত্রখানা শেষ রাত্রে বসিয়া লিখিতেছি। কাল রাত নয়টায় দানাপুর পৌঁছিয়াছি। সূর্য্যোদয়ের পরে দুই ঘণ্টার মধ্যে পুপুন্‌কী রওনা হইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কল্য কল্যানীয়া সাধনা পাঠানকোট একস্‌প্রেসে কলিকাতা চলিয়া গেল। আমি তাহাকে ধানবাদে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া "কার" খানা লইয়া সারাদিন এবং মধ্যরাত্রের কিয়দংশ নানাস্থানের কার্য্যতালিকা রক্ষা করিয়া রাত্রি বারোটায় বিশ্রাম করিতে যাইতেছি ; এমন সময়ে তারবার্ত্তা হাতে পৌঁছিল যে, মালটিভারসিটির ঘরদুয়ার তৈরীর জন্য সাইজ-করা এক ওয়াগন শাল ও গাম্ভারী কাষ্ঠ আসাম-সাপটগ্রাম হইতে দুই দিন আগে ধানবাদের দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন দে দুই একজন সহকর্ম্মী সহ এই কাঠগুলি সংগ্রহ করিতে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছে। গৌহাটীর ধনীরাম লিখিয়াছে,—"কাঠগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। উৎকৃষ্ট কাঠ! কি যে শ্রম এগুলি সংগ্রহ ও চিরাই করিতে গিয়াছে, বলিবার নহে।"

নলিনীর প্রতি মনটা অমনিতেই যথেষ্ট প্রসন্ন ছিল। এই পত্র পাইবার পরে আরও প্রসন্ন হইল। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া এভাবে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী শ্রম দিয়া সকলে মিলিয়া একটী উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে পার। সকলের শ্রমের সমযুক্ত সহযোগ যে কত বড় একটা সম্পদ, তাহা ভাবিবার ও বুঝিবার দিন আসিয়াছে। এযুগে ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল দিয়া বড় বড় কাজ হয় না, বহু জনের সর্ব্ব-

সামর্থ্যের সমযোগের দ্বারা তাহা হয়। তোমরা মনে, প্রাণে, বাক্যে, চিন্তনে, প্রয়াসে এবং প্রযত্নে ঐক্য বিধান করিবার কৌশলটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় নামিবে? প্রয়াস বলিতে আমি যত্ন বা চেষ্টাকে বুঝাইতেছি, প্রযত্ন বলিতে প্রকৃষ্ট প্রয়োগ বা প্রকৃষ্ট চেষ্টাকে বুঝাইতেছি।

মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে চারিজনে দশজনের কাজ করিতে পারিবে। অন্যথায় চারিজন হইতে দেড়জনের কাজও আদায় হইবে না। ঐক্য এবং সংহতির বড় দাম।

আমি মুখের ভাষা দিয়া তোমাদের হৃদয় জয় করিতে চাহি না। সেই সুচতুর ভাষা আমি শিখি নাই। আমি প্রাণময় আহ্বানে তোমাদিগকে জাড্যপরিহার করিতে বলিতেছি। যে আমার কণ্ঠ শুনিতে পাইয়াছ, সে অবিলম্বে সাড়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ কলিকাতা

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভোরে পুপুন্‌কী ছাড়িয়াছি। বরাকরে পৌঁছিলাম আটটায়। আহারাদি সারিয়া দশটার সময়ে রওনা হইলাম অণ্ডাল। আসিয়া দেখিলাম,

অণ্ডাল আশ্রমের ধানক্ষেতের ধান সব কাটিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। এখনো মাড়াই সুরু হয় নাই। পুপুন্‌কীর ধানও খামারে দেখিয়া আসিয়াছি। প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন,—অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্‌ব্রতম্।

অণ্ডাল সম্পর্কে একটু মন্তব্য করিতে হইতেছে। এখানে কেবল জমিটুকুই কিনিয়া দিয়াছি। চাষের খরচ দেই নাই, মজুরের টাকা পাঠাই নাই, এমন কি মন দিয়া কাজ কর বলিয়া কাহাকেও কোনও পত্রও লিখি নাই। কিন্তু চারি বিঘা পতিত জমি কিনিয়া দিবার কয়েক মাস পরে আসিয়া দেখিলাম শ্রীমানরা চল্লিশ মণের মত ধান কাটিয়া তুলিয়া গুচ্ছগুলি কি মনোরম করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। গ্রামবাসী সজ্জন ও যুবকেরা নিজ নিজ প্রেমের প্রেরণায় দিনের পর দিন ধান্যক্ষেত্র-নির্ম্মাণে, ধান্য রোপণে, ফসল-সংগ্রহে অকাতর পরিশ্রম করিয়াছেন। আর পুপুন্‌কীতে? সেখানে পয়সা খরচ করিয়াও লোক মিলে নাই, কোথায় কলিকাতা, কোথায় হুগলী, কোথায় জলপাইগুড়ি আর কোথায় ত্রিপুরা,—সেখান হইতে শ্রমদানী কর্ম্মীরা ছুটিয়া আসিয়া আশ্রমের ইজ্জত বাঁচাইয়াছে। আগামী বর্ষায়ও ঠিক ১লা শ্রাবণ তারিখে সুদূর স্থানগুলি হইতে শ্রমদানী কর্ম্মীদের আনিয়া পুপুন্‌কী-কৃষির প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।

অনুভবে বুঝিতেছি, হয়ত অণ্ডাল নিজ কর্ম্মগুণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে জঠরে পুরিয়া ফেলিবে। এইরূপ স্থান ক্ষুদ্র হইলেও মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

অণ্ডালে কেহই আমাদের পত্র পায় নাই। ভালই হইল। প্রগ্রাম

আর প্রতিপালন করিতে হইল না। রাত সাড়ে সাতটায় কলিকাতা পৌছিয়াছি। পথে ইটের কাদা তৈরী করার পাগিং মিল দেখিয়া আসিলাম। কাজ না দেখিয়াই একটা মেশিন সাড়ে পাঁচ শত টাকায় কিনিয়া পুপুন্‌কী নিয়াছিলাম। এবার কাজ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এবার পুপুন্‌কীতে ইট কাটাটাই আমার প্রধান কাজ। চেষ্টা আছে, যাহাতে অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ ইট বৈশাখের মধ্যে আগুনে পুড়িতে পারি। কিন্তু আমার প্রয়োজন যত বেশীই হউক, আয়োজন নিতান্ত অপ্রচুর। অসুবিধা দেখিয়া জীবনে কদাচ ঘাবড়াইয়া যাই নাই, এবারও যাইব না। তোমরা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কাজ কতটুকু হইল জানিবার জন্য তোমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব কিন্তু কাজ করিতে হইলে অনেক কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন। যেমন যেমন সুযোগ আসিতেছে, তেমন তেমন সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতেছি।

বোকারো ইস্পাত কারখানা আমেরিকানরা নিবে নিবে করিতেছিল। লৌহ-দানবের বিকট মূর্ত্তি আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি ছিনাইয়া নিতে চলিয়াছিল। কোনও প্রকারে বৃহদংশ বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন রাশিয়া বোকারো কারখানা হাতে নিতে চলিয়াছে। আশ্রমকে এখন আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বশক্তি দিয়া উদ্যত হইতে হইবে। সময়ের এত মূল্য ইহার পূর্ব্বে আর কখনো অনুভব করা যায় নাই। তোমরা এই সময়ে কে কি ভাবিতেছ, জানিবার উপায় নাই। ব্যাপক ভাবে কেহ কিছু করিতে নামিয়াছ, তাহার পরিচয়ও জানা যায় নাই। মোহগ্রস্ত হইয়া দলে দলে এখানে ওখানে পড়িয়া রহিয়াছ একেবারে নির্জ্জীব জড়পিণ্ডের মত। দৃশ্যটা মনোরমও নহে, উপভোগ্যও নহে। চতুর্দ্দিকে কেবল ন্যুব্জপৃষ্ঠ মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা হতাশাবাদী নরনারীদেরই

দেখিতেছি। দুঃসাহসের বা সৎসাহসের লেশমাত্র তাহাদের অন্তরে নাই। তাহাদের প্রতি প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকার মতন বোকামি আর কি আছে? একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া যাহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়ায় বা কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, মহৎ কর্ম্ম, মহৎ প্রতিষ্ঠান তাহাদের ভরসায় চলে না। সবল মেরুদণ্ডের লোকেরা কোথায়, কেবল এই কথা ভাবিয়াই দূরদূরান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি। অথচ সময় নাই হাতে।

১লা শ্রাবণ পুপুন্‌কীতে যাহারা শ্রমদানী কর্ম্মী রূপে আসিতে চাহ, তাহারা শক্ত করিয়া কোমর বাঁধ, দৃঢ় হস্তে কাপড় কাছ। পুপুন্‌কীর শ্রমে চাই দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস। লড়াই এখানে মাটির সঙ্গে নহে, পাথরের সঙ্গে। বীজবপন এখানে কোমল মৃত্তিকায় নহে, মরুভূমিতে। বৈদ্যুতিক পাম্প দিয়াও সবটুকু বাগান আমরা ভিজাইতে পারিতেছি না। এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় মনে হইতেছে বৈদ্যুতিক পাম্প আরও একটা হয়ত বসাইতে হইবে। কত জল যে এই মৃত্তিকা শোষণ করে, ধারণা করিতে পারিবে না। ১৩৩৪ বাংলা হইতে এখানে অর্থের অঞ্জলি ঢালিতেছি, এই সেদিন পর্য্যন্ত সবই নিতান্ত জলাঞ্জলি রূপে দেখিয়াছি। আজ চিত্রটা রূপান্তর ধরিতেছে কিন্তু তৈলচিত্রের রংয়ের মতন বড় ক্লেশে বড় দেরীতে ক্যানভাসে রং ধরিতেছে। আরও যে কত আয়ু এখানে ক্ষয় করিতে হইবে, বুকের তাজা রক্ত আরও যে কত এ মাটিতে ঢালিতে হইবে, ভাবিয়া পাই না। তবু, যাহা ধরিয়াছি, তাহা সফল না করিয়া ছাড়িব না, জিদ করিয়াছি। এ জিদ তোমাদেরও আসে কি?

এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারিবে তখন, যখন বলিতে পারিবে, ঈশ্বরে তোমাদের বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরে যাহাদের বিশ্বাস আছে,

তাহারা সব করিতে পারে। তাহাদের অসাধ্য কোনও কাজ নাই। তোমরা তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে খাঁটি কর, সত্য কর, অকপট ও অকৃত্রিম কর। সব জিনিষে ভেজাল চলিলেও এই জিনিষে ভেজাল চলিবে না। তৈল, ঘৃত, আটা, ময়দা, চিনি, চাউল প্রভৃতি সব জিনিষের ভেজাল চলিতেছে বলিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসেও ভেজাল চালাইতে পারিবে, এই ধারণা কেহ করিও না। নিজ নিজ ঈশ্বরবিশ্বাস খাঁটি কিনা, এখনি পরীক্ষা কর।

জগতের যত আছে সৎকাজ, সকলের চেয়ে সেরা সৎকাজ পরমেশ্বরে লগ্ন হওয়া, পরমেশ্বরকে আপন বলিয়া জানা, তাঁহাকে নিজের অন্তরে পাওয়া, তাঁহার সহিত এক, অভিন্ন, অদ্বৈত সত্তায় বিরাজ করা। এই পরম সৎকাজটী আগে বজায় রাখ, তার পরে অন্য কাজে মন দিও। তাহা হইলেই আর কোনও কাজে ভুল হইবে না।

অহঙ্কার বারংবার আত্মবিস্মৃতির সৃষ্টি করে। আর এই বিস্মৃতি হইতে পাপের জন্ম হয়। পাপ তাপ সৃষ্টি করে। তাপ জ্বালা দেয়। জ্বালা মনের ঐকান্তিক অভিনিবেশকে বিক্ষিপ্ত করে। বিক্ষেপ লক্ষ্য-লাভে অযোগ্যতা জন্মায়। প্রাণপণে অহঙ্কার, অভিমান, স্পর্দ্ধা, দর্প, দম্ভ এবং পরপীড়নবুদ্ধি ত্যাগ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ছেলের পত্রে আমি সব ব্যাপার জানিয়াছি। গ্রামের মধ্যে তুমি সবার চেয়ে গরীব আর জাতেও তুমি ছোট, অতএব কোথাও কোনও চুরি হইলে তোমারই গৃহে চুরির মাল খুঁজিবার জন্য গ্রামের প্রধানেরা আসিয়া হানা দিবেন, জুতা লইয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিবেন, জুতা ছাড়িয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিতে অনুরোধ করিলে তোমার ঔদ্ধত্য এবং দুর্ব্বিনয়ের জন্য সামাজিক শাসন করিবেন,—এগুলি ত অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ধনীরা চুরি করিলে এদেশে তাহারা বাহাদুর, গরীবেরা চুরী না করিলেও এদেশে তাহারা চোরের চোর। কোটি কোটি টাকা যাহারা লুট করিয়া নিতেছে, তাহারা এদেশে পূজ্য এবং বরেণ্য, গরীব বেচারী পয়সা দিয়া জুতা কিনিলেও সেটা তার চুরীর ধন। তোমাকে যে ভাবে সামাজিক নিপীড়ন করা হইয়াছে, তাহাতে অন্য গরীবেরা মাটিতে মিশিয়া যাইত। তোমার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে, এজন্য তুমি এখনো মাথা উচু করিয়া রহিয়াছ। এই মাথা তুমি চির-কাল উচাই রাখিও, কদাচ ইহা মিথ্যা ও অন্যায়ের নিকটে নত করিও না।

সমাজে যাহারা সম্মানিত, তাহাদের সম্মাননাশে আমি তোমাকে প্রণোদনা দিতেছি না। কিন্তু তোমার যাহা আত্ম-সম্মান, তাহা তুমি কোনও প্রকারেই ধূলায় লুটাইয়া দিতে পার না। দুইশত বৎসর ইংরাজের

পদতল চাটিয়াও এদেশের শিক্ষিত সমাজের ভিতর হইতে দাসত্বের মোহ দূর হয় নাই। আবার ইহারা অন্য কাহারও ক্রীতদাস হইতে চাহে। এই জন্যই সংবিধানে সর্ব্বজাতির সমান অধিকার স্বীকার করিবার পরেও যে যেখান দিয়া যত পারে, তথাকথিত ছোট জাতগুলির উপরে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালাইয়াছে। তোমরা এ রোলারের চাপে চূর্ণ হইবে না, এই জিদ আর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এক কথা নহে।

বস্তুতঃ বিদ্বেষের দ্বারা কেহ লাভবান্ও হইবে না,—না বিদ্বেষকারী, না বিদ্বিষ্ট। বিদ্বেষ উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্ত্যজ বা অভিজাত প্রত্যেকেই এক পরমেশ্বরের সন্তান, ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক, শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্টের নহে। সুযোগ পাইলে গরীবের ছেলেরা ধনীর দুলালদের চেয়ে অধিক কৃতিত্ব যে দেখাইতে পারে, তাহার প্রমাণ আছে। সুযোগ পাইলে অন্ত্যজের ছেলেরা যে অভিজাতের ছেলেদের চেয়ে উন্নতি করিতে পারে, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। মানুষ একটা মাত্রই জাতি। তাহাকে নানা ভাগে বিভক্ত করার ভিতরে সামাজিক শৃঙ্খলার সুবিধা হইতে পারে কিন্তু তাহার দরুণ একজনকে অপরের বিদ্বেষ বা ঘৃণার পাত্র করিবার মধ্যে কোনও সঙ্গতি নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মসম্মান নিয়া সমাজে বাস করুক এবং নিজ আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই, অপরের আত্মসম্মানে আঘাত-দানে বিরত থাকুক।

আমার পত্রখানা যতজনকে পার দেখাইও এবং প্রতিজনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা সংসারের অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা আমার নিকটে কেন লেখ? তোমরা কি ভগবানের নিকটে প্রার্থনায় বসিতে পার না? তোমাদের অভাব অভিযোগ অশান্তি দূর করিবার ক্ষমতা কি ভগবানের নাই?

বলিবে, মনের কথা না জানাইলে শান্তি পাও না। ভাল কথা। শান্তি যদি পাও, সবই জানাইও। কিন্তু প্রতিটি পত্রেরই জবাব প্রত্যাশা করিবে কেন? তুমি কি একাই একখানা পত্র লিখিতেছ? অথবা একমাত্র পত্র পড়া আর পত্র লেখা ছাড়া আমার আর কোনও কাজ নাই?

আরও কাজ আছে এবং সেগুলির অধিকাংশই আমার ব্যক্তিগত কাজ নহে। সে সব কাজ, তোমাদেরই কাজ। তোমরা তোমাদের জন্য যাহা করিতে অবহেলা করিয়াছ বলিয়া দেশের ও দশের দারুণ দুর্গতি কিছুতেই দূর হইতেছে না, আমি তোমাদের হইয়া সেই সকল কাজগুলি করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমাকে এসব কাজ করিবার জন্য তোমাদেরই উচিত উপযুক্ত অবকাশ সৃজন করিয়া দেওয়া। তাহা না করিয়া উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া বিব্রত করা তোমাদের অনেকের একটা রোগ-বিশেষ হইয়াছে দেখিতেছি।

কেহ কেহ আছে, যাহারা অত্যধিক সংখ্যায় পত্র লেখে সর্ব্বত্র এই

উদ্দেশ্য নিয়া যে, লোককে দেখাইবে, আমি তাহাদের নিকটে কত বেশী পত্র লিখিয়াছি। বেশী পত্র পাইবার ভিতরে যেন একটা কৃতিত্ব বা গৌরব রহিয়াছে।

তাহা কিন্তু নাই। পত্র পাইয়া যে তদনুযায়ী কাজ করে, পত্র পাওয়ার মধ্যে সার্থকতা শুধু তাহারই। অন্যের পত্র পাওয়া একটা বিলাসিতা মাত্র। বিলাসিতা আয়ু, অর্থ, ও শক্তির অপব্যয় মাত্র।

জীবন হইতে তোমরা সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা এবং বাহাত্তরীকে দূর কর। কে কত বেশী কাজ করিতে পার, তার দিকে মন দাও। পণ কর যে, জীবনের একটী মুহূর্ত্ত সময় বৃথা বহিয়া যাইতে দিবে না। জিদ কর, এই জন্মেই তোমাদিগকে কোটি জন্মের তপস্যা পূর্ণ করিতে হইবে লক্ষ কোটি জন্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। মানুষ হইয়া যখন ধরাধামে আসিয়াছ, তখন প্রকৃত মানুষের মতনই তোমাদের কাজ করিতে হইবে।

প্রকৃত মানুষ বৃথা কথা বলে না, বৃথা চিন্তায় সময়-কর্ত্তন করে না, অলাভজনক বা অল্প-লাভকর অধ্যবসায়ে নিজেকে লিপ্ত করে না। নিত্য লাভের দিকে তার দৃষ্টি এবং অখণ্ড পৌরুষ সহকারে সে, দিন নাই, রাত নাই, কেবল কাজ করিয়া যায়। মানুষের জনম দেবজনমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, একথা যে সত্য, ইহা তোমাদিগকে প্রমাণিত করিতে হইবে।

ঈশ্বরনিষ্ঠ হও। নামে মগ্ন হও। প্রেমে পূর্ণ হও। স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতার আধার হও। কোটি বিশ্বের প্রতিটি দুঃখার্ত্তের স্নিগ্ধ আশ্রয় হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মন হইতে সকল দুর্ব্বলতা, সকল অবসাদ-খিন্নতা দূর করিয়া দাও। বিশ্বাস কর, তোমার একটী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎ তুমি তোমার নিজ হাতে নির্ম্মাণ করিবে। ভাগ্য নামে কে একজন ক্লীব দেবতা তোমার ভবিষ্যৎ গড়িয়া দিবেন, এই কুসংস্কারকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। কেন তুমি অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিবা-রাত্র কেবল দুঃখের মালা জপিতেছ? জীবনে ভুলত্রুটি কিছু করিয়া থাকিলে তার জন্য সমস্ত জীবন অনুতাপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে ক্ষতি হইবার, হইয়াছে, আর কোনও নূতন ক্ষতি না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হও। জীবন এক মহাকুরুক্ষেত্র, এখানে কাপুরুষের স্থান নাই। আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়া তোমাকে সংগ্রামজয়ী হইতে হইবে।

দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে পরমেশ্বর-স্মরণ কর। তাঁহার চরণ হইতে অপার বিক্রম আহরণ কর। কদাচ নিজেকে অক্ষম, অযোগ্য, হীন বা অপদার্থ বলিয়া মনে করিও না। যে আজ দুর্ব্বল, কাল সে সবল হইবে। যে আজ অক্ষম, কাল সে সক্ষম হইবে। বললাভের জন্য, ক্ষমতার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। পরিস্থিতি প্রতিকূল বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে আছি, এই বিশ্বাসটী রাখিও।

তোমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জগতের এক মহান্ বিস্ময় সৃষ্টি করিবে। এই সত্যে তোমরা বিশ্বাস কর। বিশ্বাসীর বুকে অফুরন্ত বল। সেই বল সহায় করিয়া তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রম করিয়া জগতে অসাধ্যসাধন কর।

জগতে তোমরা মহাবিপ্লব আনিবে। মানুষকে তোমরা দেবতায় পরিণত করিবে। মানবজীবনের তোমরা মূল্য ও মর্য্যাদা বাড়াইবে। মর্ত্ত্য-ভূমিকে তোমরা স্বর্গের সুষমা দিবে। রুক্ষ রুষ্ট উষ্ণ মরুভূমিকে তোমরা তুষারধবল গিরিশিখরের স্নিগ্ধ শীতলতা দিবে। কামুককে তোমরা প্রেমিক করিবে, স্বার্থপরকে তোমরা নিষ্কাম করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

কলিকাতা

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার সবগুলি কথাই বাসী হইয়া যাইবার পরে কাজে লাগিতেছে। বাইশ বছর আগে বলিয়াছিলাম, যাও সবে পূবের পাহাড়ে, নূতন বাড়ী, নূতন ঘর কর। শোন নাই। এখন সেই ত্রিপুরার পাহাড়েই উদ্বাস্তুর বেশে মাথা গুঁজিবার জন্য বৃক্ষতল অন্বেষণ করিতেছ। বলিয়াছিলাম, বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে গিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার প্রচার-প্রসার কর। কেহ কর্ণপাতও কর নাই। আজ আমাকে

ডাকিতেছ, সরকারী প্রচেষ্টায় আহুত সভা-সমিতিতে দাঁড়াইয়া পাহাড়ী-দের ভিতরে ভারতীয় ভাবধারা সম্পর্কে বাগ্মিতা দেখাইতে।

আরে, আমার যাহা কাজ, তাহা ত' আমি কাহারও অনুরোধ-উপরোধ বিনাই করিয়া যাইতেছি এবং করিয়া যাইতে থাকিব। কিন্তু আমি কি কোথাও সরকারী এজেণ্টরূপে যাইতে পারি, না কাজ করিতে পারি ? আমার কাজের রীতি, নীতি, স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতা সম্পর্কে তোমাদের কি কোনও জ্ঞানই নাই ?

আমার শরীরটা এখন অন্য কাজে আবদ্ধ, পাহাড়ে ইহাকে ঠেলিয়া নিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে আমার হইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে প্রেমের প্লাবন বহাইতে সুরু কর।

রাজনীতি আমার অস্ত্র নহে, আমার অস্ত্র প্রেম। যেই প্রেম ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভেদ স্বীকার করে না, জাতিতে জাতিতে বৈর সৃষ্টি করে না, স্বার্থের সহিত স্বার্থের সংঘাত আনয়ন করে না, আমার সম্বল সেই প্রেম। রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিয়া আমাকে প্রেমানুশীলন করিতে হইবে। যে রাজনীতি একজন সুভাষচন্দ্রের মত ব্যক্তিকে স্বীকার করিয়া নিতে কুণ্ঠিত, একজন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর কারণ অনু-সন্ধান করিতে অস্বীকৃত, দেশব্যাপী নির্য্যাতন-কালে একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষা-ভাষী নির্য্যাতিতকে অভয় দিতে দ্বিধাগ্রস্ত, সেই রাজনীতির পঙ্ক মাখিয়া আমি আমার গাত্র কলঙ্কিত করিতে পারি না। এই কারণেই আমাকে ও তোমাদিগকে পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ রাজনীতির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়াই করিতে হইবে। মাইকেল স্কটের ধর্ম্মপ্রচারে রাজনীতি থাকিলে দোষ নাই, কিন্তু স্বরূপানন্দের ধর্ম্মপ্রচার রাজনীতিমুক্ত থাকিতে বাধ্য।

তোমরা অবিলম্বে বন-পাহাড়গুলির মধ্যে ঢুকিয়া যাও। যে কয়টা স্থানে আমার আশু ভ্রমণ প্রয়োজন বলিয়া লিখিয়াছ, তার দুই একটা স্থান ছাড়া বাকী সবগুলি আমারই পূর্ব্বসৃষ্ট কর্ম্মভূমি। অনেক শ্রম আমি ঐ সকল স্থানে করিয়াছি। আরও অনেক শ্রম ঐ সকল স্থানে এবং আশে পাশে করিতে হইবে। যখন এই পার্থিব শরীরটা লইয়া গিয়া উপনীত হইতে পারিতেছি না, সেই সময়ে তোমরা প্রতিজনে আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই সেই স্থানে ছুটিয়া যাও এবং নিরলস কর্ম্ম তথা অনাসক্ত সেবা দিয়া সকল পরকে আপন কর।

যাহারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে ভারতের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত নহে। এই কর্ত্তব্য তাহাদের, যাহারা ভারতের সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকা যে জাতিবিশেষের পক্ষে লাভজনক, তাহা নিজেদের আচরণে প্রমাণ করিতে সমর্থ। কে ভারতের ভিতরে কে ভারতের বাহিরে, ইহার বিচারে কাহাকেও আপন বা পর বলিয়া জ্ঞান করা আমাদের কাজ নহে। যে-কেহ বিশ্বের ভিতরে থাকিলেই সে আমাদের আপন হইবার যোগ্য। আমরা রাজনৈতিক অভিসন্ধি-বর্জ্জিত ভাবেই আমাদের কাজ করিয়া যাইব। কাজ যদি আমরা সত্য সত্য করিতে পারি, সত্য ফলই আমরা পাইব, মিথ্যাফল বা মাকাল ফল আহরণ করিব না।

তোমরা কাজ করিয়া যাও, সকল প্রকার রাজনৈতিক সংস্কার মন হইতে দূর করিয়া দিয়া। যেহেতু ভারত তোমার স্বদেশ, এদেশের প্রতি তোমার অনুরাগ স্বাভাবিক। ইহা দোষ নহে, পাপ নহে, অপরাধ নহে। কিন্তু মানব-সমাজের সেবা করিতে যাইয়া রাষ্ট্রবিশেষের রাজ-

নৈতিক স্বার্থ-সাধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য নিয়া তোমরা ধর্ম্মের চর্চ্চা, প্রচার, প্রসার বা প্রচলন করিতে পার না। ভারতে উদ্ভূত ধর্ম্মমত মাত্রই পরমতে বড়ই সহিষ্ণু, অতএব তোমরা অবিচল আদর্শে যদি তোমাদের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া যাইতে পার, আপনা আপনি পৃথিবীতে অত্যধিক সংখ্যায় পরমশান্তিপ্রিয় ধার্ম্মিকদের আবির্ভাব সম্ভব হইবে।

একটু সুযোগ ঘটিলেই আমি অতি দ্রুত পাহাড়ী অঞ্চলে আমার ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করিব। কিন্তু পুপুন্‌কীর মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের অতি জরুরী কাজ আমার ভ্রমণের উদ্দাম স্বাধীনতা সাময়িক ভাবে অপহরণ করিয়াছে। প্রচুর ধনাঢ্যতা থাকিলে মানুষ যাহা করিতে পারে, যথেষ্ট অর্থবল না থাকিলেও কি তাহা পারে? সুতরাং তোমরা কর্ম্মব্যস্ত আমাকে পাহাড়ে প্রবেশ না করাইয়া নিজেরা দ্রুত কাজে নামিয়া পড়। কোন সঙ্ঘনেতা বা কর্ম্মিদল-স্রষ্টা শুধু একা একা দেশে দেশে কাজ করিয়া বেড়াইয়াছেন? তাঁহাদের হাতের কাজ দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ জন সহকর্ম্মী নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছেন, এক এক জন এক এক দিকে এক এক স্থানে কাজ করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন, সকলের যুগপৎ এবং পদ্ধতিবদ্ধ শ্রম চারিদিকে সমভাবে একটী একটী করিয়া পোঁচ দিয়া বিচিত্র আলেখ্যের রূপরেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তোমাদের মধ্যে তাহার অন্যথা কেন দেখিতে পাইতেছি? যে সময়ে অন্যত্র কেহ কেহ কাজ সুরু করিয়াছে, সেই সময়ে নিজ নিজ স্থানে কেন তোমরা স্থাণুর মত বসিয়া রহিয়াছ?

ভারতবর্ষ এতদ্দেশজাতদিগকে চিরকাল শিখাইয়া আসিতেছে, বসুধৈব কুটুম্বকম্। সেই দেশের সন্তান তোমরা, যখন যাহা করিবে,

নিখিল বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে অপর সকল মানুষের অন্তরঙ্গ আপন-জনে পরিণত করিবার বুদ্ধি লইয়া করিবে। ইহার ভিতরে রাজনীতি নামক জটিল বস্তুটা নাই। কাল ভারতের যেই সীমা ছিল, আজ সেই সীমা নাই। আজ যে সীমা আছে আগামী কাল তাহা বাড়িতে পারে, আগামী পরশু তাহা কমিতে পারে। যেই সপ্তসিন্ধুর নাম করিয়া আজও উপবীতী ব্রাহ্মণ অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী আদির আবাহন করেন, তাহার মধ্যে কোনও কোনও পুণ্যসলিল আজ ভারত-সীমান্তের বাহিরে পাকিস্থানের কুক্ষিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। তথাপি ঐ নদনদী ভারতীয় সংস্কৃতির অনুগামী ধার্মিকের নিত্যস্মরণীয়। এই একটা দৃষ্টান্ত হইতে তাৎপর্য্য আহরণ কর যে, ভারতের সীমান্ত-সঙ্কোচ বা সীমান্তবৃদ্ধির সহিত ভারতীয় ধর্ম্মচেতনার কোনও অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ নাই। গঙ্গাযমুনা-সিন্ধু-কাবেরী-স্মৃতি মন্থন করিতে যাইয়া বারংবার তোমাদের আধ্যাত্মিক অনুরক্তি মানুষের গড়া সীমান্তকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে এবং চিরকাল তাহা যাইবে।

এই সাধারণ কথাটুকু মনে রাখিয়া তোমরা পাহাড়ীদের ভিতরে কাজ করিও। ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মানুষ যদি সুলভ অন্ন পায়, ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মানুষ যদি জীবন ও সম্পদকে সুরক্ষিত বলিয়া অনুভব করে, ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া মানুষ যদি নিজের দেহ ও মনকে সঙ্গত স্বাধীনতার পূর্ণ সম্ভোগে বাধাহীন দেখে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভারতের প্রতি অনুরক্ত রাখিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কোনও কূটকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে না। কাশ্মীরে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে এম-এ ক্লাসের পড়া পর্য্যন্ত বিনা-মূল্যে পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল, কেন্দ্রীয় রাজকোষ হইতে সারা ভারতের প্রাপ্য

অর্থ টান মারিয়া নিয়া রাস্তায় রাস্তায় কাশ্মীরের অকূল পাথারে ছড়িয়া মারা হইল, তথাপি কাশ্মীরে কাশ্মীর-শার্দ্দূল হইতে সুরু করিয়া কাশ্মীর-শৃগাল পর্য্যন্ত প্রায় সকলে কাশ্মীরকে ভারতের বাহিরে টানিয়া নিবার জন্য গর্জ্জন ও চীৎকার সুরু করিয়াছেন। এমনকি, কাশ্মীর-শকুনেরা পাখার ঝাপটায় ঝঞ্ঝা সৃষ্টির চেষ্টায় উগ্রভাবে উদ্যত, কাশ্মীর-মূষিক-কুল পাথরের গায়ে দাঁত ঘষিয়া তাহাতে ধার বসাইতে ব্যস্ত। এত সুযোগ, সুবিধা, তোষণ ও পদসেবা পাইয়াও তাঁহাদের এই দুর্ম্মতি হইল কেন? তাঁহাদিগকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্ম্মকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করিবার। ইহাতে ধর্ম্মের সম্মান কমিয়াছে। ইহাতে ধর্ম্ম ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধানাশ ঘটিয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের সম্ভ্রমহানি হইয়াছে।

চোখের উপরে ইহা দেখিবার পরে তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়া দরকার। তোমরা ধর্ম্মপ্রচার করিবে রাজনৈতিক অভিসন্ধিবর্জ্জিত ভাবে। আমি তোমাদের প্রতি এই স্থায়ী অনুশাসন দিয়া রাখিতেছি।

গণতন্ত্রের দেশে অধিকাংশ মানুষের ভোটাধিকার থাকে। তোমাদের তা আছে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী। সুতরাং নির্ব্বাচনের সময়ে তোমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই এক একটা রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন-বুদ্ধি আসিয়া থাকে, কোনও কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রতিরুদ্ধ বা পরাজিত করিবার আগ্রহও অন্তরে জাগিয়া থাকে। তোমাদের সেই নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক কর্ত্তব্যের সহিত আমার কোনও বিরোধ নাই কিন্তু তোমরা যখন যেখানে যেভাবেই আমার কাজ কর না কেন, রাজনীতির সংস্পর্শ হইতে তোমরা মুক্ত থাকিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

বৈদ্যবাটী (হুগলী)
৫ই পৌষ, ১৩৭১

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। পুপুন্‌কী হইতে ইহা ঠিকানা কাটিয়া বৈদ্যবাটীতে পাঠান হইয়াছে। কাল সন্ধ্যায় বৈদ্যবাটী আসিয়াছি। আজই নবদ্বীপ যাইব। হাতে অবসর কম। সংক্ষেপে লিখিব।

এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে দুইটী সুস্পষ্ট সংস্কার আছে। একটী পিতার সুখের জন্য আত্মসুখ-ত্যাগ,—যথা ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য এবং শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ; স্বামীর জন্য স্ত্রীর অশেষ দুঃখবরণ, যথা সাবিত্রী, বেহুলা। অপরটী, পুত্রের আজ্ঞাবহতার সুযোগ নিয়া পুত্রকে দিয়া পাপ-কার্য্য করাইয়া লওয়া,—যেমন পরশুরামের মাতৃহত্যা। স্ত্রীর পতি-প্রাণতার সুযোগ নিয়া স্বামী তার পত্নীকে অসুন্দর কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে।

এই সকল ক্ষেত্রে যুক্তিহীন অন্ধ ভক্তদের পক্ষে কর্ত্তব্য-নির্ণয় কঠিন। আমি বলি, যুক্তি-পরায়ণ হও। পিতৃ-মাতৃ-গুরু-সেবার মত সৎকার্য্য আর কিছু নাই কিন্তু পিতা, মাতা বা গুরু কুকার্য্য করিতে বাধ্য করিলে তাঁহাদের অমান্য করা যায়। যে-কার্য্যে অনেকের দুঃখ, যে কার্য্যে নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা, সে কাজ পিতার আদেশে, মাতার অনুরোধে, এমনকি গুরুর নির্দ্দেশেও করা যায় না। সত্য এবং কল্যাণের অবিরোধী আদেশই পালনীয়।

তবে পিতা, মাতা এবং গুরুর সম্মানের দিকে তাকাইয়া চলা একটা মস্ত সদাচার। প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের চিন্তা ও অভিপ্রায়ের ভুল ধরিয়া বেড়ান কদাচ লাভজনক নহে, কোনও সন্তানের পক্ষে গৌরবপ্রদও নহে। আবার, তাঁহাদের আদেশের অধীনে বাধ্য হইয়া তুচ্ছ অন্যায়াচরণ করিবার অভ্যাস হইয়া গেলে, বড় বড় অন্যায়কে আর অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না,—ইহা আর একটী মস্ত বিপদ।

এই জন্যই এই জাতীয় উভয়-সঙ্কটে সর্ব্বকালীন ভাবে প্রযোজ্য কোনও বিধি বলিতে পারিতেছি না। নিজের সহজ সরল কাণ্ডজ্ঞানকে ব্যবহার করিও এবং সত্যে তথা কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই সর্ব্বশক্তি দিয়া পিতৃ-মাতৃ-গুরু সেবা করিও। ইঁহাদের সন্তোষ-সাধনের নাম করিয়া অন্যায় বা পাপাচারও করিও না, আবার সত্যের প্রতি তোমার নিষ্ঠা দেখাইবার জন্য ইঁহাদের অসম্মানও করিও না।

পরমেশ্বরের প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিটি কাজ করিও, পিতা, মাতা বা গুরুদেবের সেবা ঈশ্বরপ্রীতির অধীন রাখিয়া করিও। মানবিক কর্ত্তব্যবোধের সহিত ঐ সকল সেবার বিরোধ ঘটিলে, কোন্ পথে পরমেশ্বর প্রীত হইবেন, তাহা বুঝিয়া নিতে, বাছিয়া নিতে এবং অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইও। জীবনের বহু স্থলে পিতৃসেবার সহিত মাতৃসেবার বিরোধ আসিতে পারে, পিতৃমাতৃসেবার সহিত গুরু-সেবার বিরোধ ঘটিতে পারে, পিতৃমাতৃগুরু-সেবার সহিত দেশ-সেবারও বিরোধ জন্মিতে পারে। জগতের ঘটনাবলিতে কি যে হইতে পারে আর কি যে পারে না, তাহা বলা শক্ত। দুই গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে বিরোধ-সম্ভাবনা দেখা গেলে ভগবৎ-প্রীতির শরণাপন্ন হইবে।

ভগবৎপ্রীতির শরণাপন্ন হওয়া, কথাটীর বাস্তব মানে বড় নিবিড়

এবং গভীর। যে কার্য্য করিলে ভগবান্ তোমাতে প্রীত হইতেছেন, যে কার্য্য করিলে ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন বলিয়া তুমি অন্তরে উপলব্ধি করিবে, তাহার অনুসরণ করা বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভগবান তোমার প্রতি নিশ্চয়ই প্রীত হইতেছেন বা তোমার কার্য্যে নিজ অন্তরে অসীম পরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছেন ভাবিয়া তুমি ঠাকুর-ঘরের দরজায় নিয়া পুত্রবলি, বন্ধুবলি বা পত্নীবলি দিতে পার না। যে কার্য্যে কাহারও নিদারুণ দুঃখ, ভগবান তাহাতে সুখী হন, তৃপ্ত হন, আনন্দের উল্লাসে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন, ইহা ভাবিবার মতন মূর্খতা আর কিছু নাই। বছর তিনেক আগে তোমার এক বিকৃত মস্তিষ্ক গুরু-ভাই এক তান্ত্রিকের কাছে গিয়া উপদেশ নিয়াছিল। সে তাহার আট বৎসর বয়স্ক পুত্রকে খড়্গাঘাতে গতাসু করিয়া উৎকট উল্লাসে নাচিতে লাগিল যে, ভগবান্ সুখী হইয়াছেন। এখন সে ডিব্রুগড় জেলে যন্ত্রণা ভুগিতেছে। কেবল জেলখাটার যন্ত্রণাই নহে, পুত্রহত্যার অন্যায়-জনিত জ্বালা সে ভুগিতেছে। কালও আমি তাহার পত্র পাইয়াছি। ভগবানকে যেভাবে প্রীত করিতে গেলে অন্তরে কোনও না কোনও সময়ে অনুতাপ আসিবে, তাহাকে ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কৃত সৎকর্ম্ম বলিয়া মর্য্যাদা দিতে পার না।

যে কাজ করিলে ভগবানের প্রতি তোমার আন্তরিক প্রীতি বাড়িবে, দিনের পর দিন অনুরাগ কেবলই উপজাত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তাহাই ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম। ভগবৎ-প্রীতি সাংসারিক অসরলতা দূর করে, কপটতা, খলতা, মিথ্যাব্যবহার, হিংসাদ্বেষ ও মিথ্যাশ্রয় নিবারণ করে। যে কাজ করিয়া এই সকল শত্রু দমিত না হইয়া প্রবর্দ্ধিত, পল্লবিত, প্রসারিত হয়, তাহা একশত একটী ধূপদানী হাতে লইয়া অগুরু-চন্দনের ধূম্রজাল ছড়াইতে ছড়াইতে পাঁচ শত পাঁচটী

বিক্রমপুরী ঢাক বাজাইতে বাজাইতে শত সহস্র প্রকারের নৃত্য মুদ্রা প্রদর্শন করিতে করিতে করিলেও কদাচ ভগবৎপ্রীত্যর্থে কৃত কর্ম্ম নহে।

যতক্ষণ ঈশ্বর-স্মরণ কর, ততক্ষণই তুমি জীবিত। যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলে, তুমি মৃতদেহে পরিণত হইলে। আমরা কত সময়ে চোখ বুজিয়া জপে বসি, কিন্তু বাজে চিন্তা করি। হাতের মালা নিয়মমাফিক ঘোরে কিন্তু মনের মালা ঘোরে না, কেবল বিষয়-চিন্তা করি। এ সময়ে আমরা শবদেহ মাত্র। নিজেকে কদাচ শবে পরিণত হইতে দিবে না, এই পণ কর। প্রতিনিয়ত ঈশ্বর-স্মরণ, ঈশ্বর-মনন, ঈশ্বরানুধ্যান কর। পরমেশ্বরকে মাতার, পিতার, গুরুদেবের, জগদ্বাসী প্রত্যেকেরই পরমারাধ্য জানিয়া ইঁহাদের সকলের কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁহার চরণে শরণাগত হও। জিদ্ করিয়া ভগবানের নামে লাগ। দৃঢ়তা সহকারে ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হও। অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার চরণে লাগিয়া থাকিবার শক্তি তোমার বাড়িবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, পরম তৃপ্তি, চরম আত্মপ্রসাদ, চূড়ান্ত সার্থকতা এই ভাবে আসিবে। জীবনের ঘটনা-সংঘাত তখন সহজে সহনীয় হইবে, জীবনের বিচিত্র সঙ্কট সমূহের তখন স্বাভাবিক সমাধান আসিয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

মালোপাড়া, নবদ্বীপ
৬ই পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গুরুভাইবোনদের মধ্যে কখনও সাংসারিক প্রয়োজনে আর্থিক

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

আদান-প্রদান হইলে, যে যাহার নিকট হইতে টাকা ধার নিয়াছে, সে যাহাতে নিজের গরজে অতি দ্রুত দেনা শোধ করিয়া দেয়, তাহার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে বাধ্য করিতে হইবে। এই কাজটী না করিতে পারিলে তোমরা নিজেদের অসৎ আচরণের দ্বারা সঙ্ঘের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছ বলিয়া জানিতে হইবে।

বাধ্য করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, অন্তরে কর্ত্তব্য-বোধকে জাগাইয়া দেওয়া। শেষ উপায় সকলে মিলিয়া দেনাদারকে ধার শোধ করিতে চাপ দেওয়া। স্বভাবকে যাহারা সর্ব্বদা দিব্যস্তরে রাখিবার চেষ্টা করে, তাহারা একটী আলপিন ধার নিলেও শোধ না করিয়া পারে না। অতএব, তোমাদের গুরুভ্রাতাভগিনীদের প্রতিজনকে নিয়ত আত্মিক অনুশীলনের দ্বারা দিব্য স্তরে বিরাজমান থাকিবার জন্য উৎসাহ, প্রেরণা এবং অনুকূল পরিবেশ প্রদান করিয়া যাওয়া তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাবেও কর্ত্তব্য, সঙ্ঘগত ভাবেও এক সামূহিক কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত বা পূজিত, তাহাদের আচরণে, দৃষ্টান্তে ও চরিত্রে সর্ব্বাগ্রে আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া ঘর করিলেন না শুধু এই ভাবিয়া যে, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া জনসাধারণ আবার অপবাদগ্রস্তা পত্নীকে নিয়া ঘর বাঁধিতে শুরু না করে। নিরপরাধাকে যে শাস্তি দেওয়া যায় না, এই কথাটী শ্রীরামচন্দ্র বিস্মৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রজা-সাধারণের কাছে তিনি এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজের হৃদয়-রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে তিনি সীতাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি ভারতের রাজপুরুষগণের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু

ইত্যাদি নিয়া ভারতব্যাপী আড়ম্বরের নিদারুণ ঢলাঢলি গিয়াছে, কিন্তু কথিত হইতেছে যে, নিজের জন্য ইনি দৈনিক জনসাধারণের পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করিতেন বলিয়া ইঁহার মুখের উপরে কোনও এক মাননীয় লোকসভা-সদস্য পার্লামেন্টের সভাস্থলে দাঁড়াইয়া ইঁহাকে তিরস্কার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কোনও একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যিনি জীবনে সম্ভবতঃ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বার ইংরাজের জেলে কয়েদ ছিলেন, যদি ক্ষমতা পাইবার পরে নিজ প্রয়োজনে বা নিজের পিছনে দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ক্ষমতাশালী পুরুষেরা সর্ব্বস্তরে কেন অর্থ-অপচয়ের ছিনিমিনি খেলিবেন না? ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কট-সমূহের লেলিহান শিখার চঞ্চল আলোকে বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখ, বড়দের ভুল অপরাপরের উপরে কি পরিমাণ মারাত্মক কুপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মণ্ডলীর শ্রদ্ধেয় নেতাদের মধ্যে যদি কেহ গুরুভাইবোনদের টাকা নিয়া তাহা ফেরৎ দিতে আলস্য করে, তাহা হইলে এই সর্ব্বনাশা দৃষ্টান্ত মণ্ডলীর অতি ছোট, অতি সাধারণ সভ্যসভ্যাদিগকেও ছোটখাট অন্যায় করিতে প্ররোচিত করিবে। দুঃখের বিষয়, কোনও কোনও সহরে বা গ্রামে এমন সকল ব্যক্তি মণ্ডলীর মধ্যে প্রধান বা সম্মানিত হইয়া সংযুক্ত রহিয়াছে, মণ্ডলীর মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত যাহাদের জীবনের এবং সাধনার কোনও যোগাযোগই নাই। ইহা কি ব্রিটিশ যুগের ভারত-শাসন যে বিলাত হইতে একটা রাঙ্গামুখ আনিয়া প্রত্যেক জেলার চূড়ায় বসাইয়া দিতে হইবে, যদিও ইহারা প্রায় কেহই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানে না?

অপর একটী বিষয়ের প্রতিও তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। তোমাদের সহরে পুনরায় নাকি অখণ্ড-সংহিতা পাঠ শুরু হইয়াছে।

সংবাদটী শুভ। মহিলা অখণ্ডেরাই এই বিষয়ে অগ্রণী জানিয়া আরও সুখী হইলাম। তোমরা লক্ষ্য রাখিও, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্পের কর্ম্মিণীদের সহিত অখণ্ডমণ্ডলীর কর্ম্মীদের যেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোনও কারণেই ছিন্ন না হয়। একটী চেষ্টার পিছনে সকলের শক্তি, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যেন সংযুক্ত হয়। তুচ্ছ একটু মান আর অভিমান নিয়া যেন এমন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতরে গলদ সৃষ্ট না হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান যেমন অতিশয় ক্ষতিকর বস্তু, অভিমানও তেমন জানিও। কেহ যেন যশের লিপ্সা লইয়া কাজ না করে। যাহারা যশ চাহে, তাহাদিগকে হাজার বার প্রশংসা করিবার পরেও তাহারা মনে মনে দাবী করে,— "আমাদিগকে আরও প্রশংসা করা উচিত ছিল।" এই ব্যাধির ঔষধ নাই। এই জন্য যশোলিপ্সুরা কখনো কখনো অসঙ্গত ভাবে অপ্রাপ্য নিন্দাও পাইয়া যায়। অকারণে নিন্দিত হইয়া কখনো কখনো তাহাদের যশোলিপ্সার সুচিকিৎসাও হয়। এইটুকু মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

কর্ত্তৃত্বলোভ কখনো কখনো বৈষয়িক সুখসুবিধা লাভের আগ্রহে জন্মিয়া থাকে কিন্তু কর্ত্তৃত্বলিপ্সার আদি জন্মভূমি হইতেছে যশোলিপ্সা। কাজ করিব না, কর্ত্তৃত্ব করিব ; ত্যাগ স্বীকার করিব না, নেতা থাকিব ; সংগঠন-কার্য্য করিব না, দলকে পরিচালিত করিব;—ইহা যশোলিপ্সার অতি উৎকট ছবি। তোমরা কর্ম্ম হইতে যশোলিপ্সাকে বিতাড়িত কর।

যেখানে অখণ্ড-সংহিতা পাঠই কার্য্যতালিকা, সেখানে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের পরে হরিওঁ কীর্ত্তনে ক্ষতি নাই। কিন্তু একমাত্র অখণ্ড-বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহ, মূর্ত্তি বা স্মারকচিহ্ন সম্মুখে থাকিলে অখণ্ড-স্তোত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে পার না। সেই সকল স্থানে ওঁ শান্তিঃ-বাচন করিয়া অনুষ্ঠানটীকে সমাপ্ত করিবে। সম্রাট্‌কে যেমন

একক সিংহাসনে ছাড়া বসান চলে না, সম্রাটের বন্দনাও প্রজা বা পাত্র-মিত্রদের দিকে তাকাইয়া চলে না। অখণ্ড-স্তোত্রের নিজস্ব সম্মান তোমরা রাখিয়া চলিও।

সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি একটী জরুরী কথা। এই বুদ্ধি আমাদের কাহারও যেন কদাচ অগভীর না হয়। কিন্তু অখণ্ডোপাসনার প্রতি নিষ্ঠারক্ষা তার চেয়েও বেশী জরুরী কথা। যেইটী মুখ্য, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। ধর্ম্মীয় উদারতা দেখাইবার জন্য নানা সম্প্রদায়ের নানা রূপ সাধনাচারের সহিত যদি খিচুড়ী পাকাইতে যাও, কিছু-কাল পরেই দেখিবে যে, তোমাদের অস্তিত্বই নাই। পরমান্নকে খিচুড়ীর সহিত মিশাইও না।

এই সকল বিষয়ে তোমরা যে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পার না, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, তোমাদের গুরু-বাক্যে শ্রদ্ধার অভাব, গুরুর নির্দ্দেশে নিষ্ঠার অভাব, নিজেদের জীবনে আদেশ-পালনকে প্রতিফলিত করিবার আগ্রহের অভাব। তোমরা সকলেই ঠিক এক উদ্দেশ্যে আমাকে গুরু কর নাই। কেহ করিয়াছ না বুঝিয়া, কেহ করিয়াছ হুজুগে, কেহ করিয়াছ আমার শিষ্যবর্গের মধ্যে নেতৃত্ব করিবার সহজ সুযোগ পাইবে বলিয়া, কেহ করিয়াছ নেহাৎ হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য। এই কারণেই অনেক অতি সাধারণ কাজের নির্দ্দেশ আমাকে দুই বার, চারি বার, এমন কি দশ বার পর্য্যন্ত দিতে হইতেছে। পুণ্যধাম নবদ্বীপে বসিয়া পত্রখানা লিখিতেছি। এখানে বসিয়া জগাই-মাধাইএর কত কাহিনী শুনিতেছি। বুঝিতেছি, তোমাদের নিজেদের মধ্যে শতাধিক জগাই-মাধাই লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া একটা জগাই বা একটা মাধাইকে তোমরা দমন করিতে পারিতেছ না। নিজের ভিতরে

যাহার পাপ, সে অপরের পাপ-প্রশমন করিবে কিসের বলে? যাহাকে তোমরা দমন করিবে বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ, তোমাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তাহার দলের লোক। তোমাদের অন্তরে এই কলঙ্ক দূর না হইলে কি দিয়া তোমরা কি করিবে।

আমাকে বর্জ্জন করিবার পূর্ণ অধিকার ত তোমাদের প্রত্যেককে দিয়া রাখিয়াছি। সম্ভবতঃ তোমাদের সেই অধিকার-প্রাপ্তির বর্ষকাল আজ পঞ্চাশ পার হইয়া যাইতেছে। তোমাদের সেই অধিকার আমি প্রত্যাহৃত করি নাই। যে ইচ্ছা, আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও। কিন্তু আমার অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়া তোমরা লোকের কাছে সস্তা বাহবা পাইবার জন্য যাহা আমার নির্দ্দেশ নহে, তাহাকেই আমার পন্থা বলিয়া চালাইয়া দিবে, আমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতকে বিকৃত করিয়া প্রসারিত করিবে, ইহা ত হইতে পারে না। খ্রীষ্টধর্ম্ম যখন রোম হইতে কনষ্টান্টিনোপলে আসিল, তখন তাহা পূর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মমতসমূহের সহিত একটা আপোষ-রফা করিয়া বসিল। ইহার ফলে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িল কিন্তু খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলিতেছেন যে ইহা দ্বারা ধর্ম্মের আদিম শুচিতার রূপান্তর হইয়াছে।

কোনও কোনও ধর্ম্মমতাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম্মমতের প্রতি এত নিষ্ঠাবান যে, তাঁহারা অন্য মতকে অন্য পথকে সহ্য করিতে পারেন নাই। অকাতরে তাঁহারা অন্যধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে কদাচ তাহা করিতে বলি নাই। "জগতের সকল সম্প্রদায় আমার" কথাটার মানে এই হইতেছে যে, জগতে যেখানে যিনি যেই ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া ঈশ্বর-সাধন করিতেছেন, আমি নিজেকে তাঁহার সহিত অভিন্ন অনুভব করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুশীলন-কালে তাহার সহিত রহিয়াছি।

"আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের" কথাটার মানে এই যে, যে সম্প্রদায়ের যে সাধক যখনি আমার সন্নিহিত হইতেছেন, আমি তাঁহার মত-পথের অবিরোধী ভাবে তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম বর্দ্ধনের কাজে নিয়ত যত্নবান্ রহিয়াছি। জগতের সকল সম্প্রদায় আমার বলিয়া আমি প্রতিটী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের দিন কাহারও অনুকরণে নষ্টা চন্দ্রার নারিকেল চুরি করিব, কালী পূজার পাঁঠা বলি দিব, চড়ক পূজার বর্শি পিঠে বিঁধাইব, অমাবস্যার গভীর নিশীথে পঞ্চমকার-সাধন করিব, ঈদের দিনে গো-কোরবাণী করিব, অথবা বিশেষ এক পুণ্যদিনে পাত্রমধ্যস্থ মদ্যপানে পবিত্রাত্মার পবিত্র শোণিতের সম্মান করিব, ইহা কদাচ হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে অসাম্প্রদায়িক হওয়া আর লোকের কাছে অসাম্প্রদায়িক খ্যাতি লাভ করা সকল সময়ে এক কথা নহে।

লোকের কল্যাণের জন্য তোমরা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প চালাইতেছ, লোকের কাছে সম্মান পাইবার জন্য নহে, এই কথাটী স্মরণ রাখিতে ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি ওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৮ পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল রাত্রি আটটার সময়ে ধানবাদ ষ্টেশনে হইতে তিন ট্রাক সাইজ-

করা শাল ও গাম্ভারী কাঠ নিরাপদে আসিয়া আশ্রমে পৌছিল। তোমরা সকল স্থানে পথে পথে ওয়াগন নিরাপদে আসিবার অনুকূলে যে শ্রম করিয়াছ বা করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। এখন হইতেই তোমরা চেষ্টা রাখ, যে পথে এবার ওয়াগন আসিল, সেই পথে পরবর্ত্তী কালের ওয়াগন আসিলে যেন প্রত্যেকটী জরুরী স্থানে ওয়াগনের তদারকের জন্য আমাদের লোক থাকে। কি চমৎকার কাঠ যে আসিয়াছে, কি বলিব এবং খুব সম্ভবতঃ পথে এক টুকরা কাঠও চুরী হয় নাই। আড়াই হাজার টুকরা কাঠ এভাবে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রমে আসিয়া পৌছা একটা অসাধারণ ঘটনা। ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করিয়াছেন, তবু ইহাতে তোমাদের কৃতিত্ব আছে। তোমরা শ্রম করিলেই তিনি অসাধ্য ঘটান। এইরূপ অসাধারণ ঘটনা তোমরা প্রত্যেক ব্যাপারেই ঘটাইতে পার। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও এবং উদ্দত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করিও।

একটী মাত্র কার্ড। সঙ্গে সঙ্গে নলিনীরঞ্জন উদ্যত হইয়া উঠিল। ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক। মাশুল সহ কাঠগুলির দাম পৌনে পাঁচ হাজার টাকা পড়িয়াছে। টাকার চিন্তাও প্রথমটায় আমাকে করিতে হয় নাই। যেমন অর্ডার পাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নলিনী নিজে টাকা চালাইয়া ঐ অঞ্চলের সব চেয়ে ভাল জায়গা হইতে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাঠ সংগ্রহ করিয়া চিরাই করিয়াছে। মাল এখানে পৌছিয়া গিয়াছে, আমি আস্তে আস্তে দাম শোধ করিতেছি। কাঠ যাহা আসিয়াছে, অধ্যয়ন-ঘরের চৌদ্দ খানা দরজার পাল্লা, ঊনবাট খানা জানালা এবং তাহার পাল্লা হইয়া যাইবে। মঙ্গল বাঁধের কংক্রিট দেওয়ালকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাহার উপরে যে চতুস্তল ছাত্র-নিবাস নির্ম্মিত হইতে যাইতেছে, তাহার ত্রিশ খানা দরজা ও দরজার পাল্লা তথা ঊনাশি খানা জানালা ও তাহার

পাল্লা হইয়া যাইবে। ইহার পরেও কিছু কাঠ বাঁচিবে। বিরাট রান্নাঘরটা শাল, গাম্ভারী আর বনসুন কাঠের ফাইলে ও তক্তায় ভরিয়া গিয়াছে। যে দেখে, সেই বলে, কি চমৎকার! শুনিয়া তোমাদেরও নিশ্চয় সুখানুভব হইতেছে।

দুই শত ফুট লম্বা বিরাট কলঘরটার নাম-বদল করিয়া দিয়াছি। দোতালার ভিত্তিযুক্ত এই বিরাট ঘরটা এমনই মনোহর হইয়া উঠিতেছে যে, ইহাতে তেলের ঘানি, ডালের কল আটার কল, আর চিড়ার কল বসাইতে আমার সহকর্ম্মীরা কেহই সম্মত হইতেছে না। সুতরাং ইহার নাম হইয়াছে "অধ্যয়ন"। নীচের শ্রেণীর ছাত্ররা এখানে পড়িবে। এক এক তালায় বিরাট বিরাট ছয় খানা করিয়া ঘর, শিশু-শ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত হইবে না।

তোমাদের ত কত জনের কত রকম সাংসারিক চিন্তা আছে। আমার চিন্তা এই একটী বিষয় নিয়া। আমার চিন্তা,—

"ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত"।

সেই জাগরণকে সন্নিহিত করিবার জন্যই আমার আকুলতা। সুদুর্ল্লভ দুই চারি জনেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছে মনে হয়। তোমরা অনেকেই খোলা চোখে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়াও ধ্রুবতারাটিকে দেখিতে পাইতেছ না। যাহারা সপ্তপ্রস্থ বস্ত্র দিয়া চোখ বাঁধিয়া আকাশ-পানে তাকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের উপলব্ধির সহিত তোমাদের এই উপলব্ধির সাদৃশ্য এই কারণেই অতীব আশ্চর্য্য রকম। সাধনা, নিতাই, ফণী প্রভৃতি সকলকে লইয়া সকাল হইতে বেলা তিনটা

পর্য্যন্ত বাহিরের স্তূপীকৃত কাঠের ফালিগুলি রান্নাঘরে প্রবেশ করাইলাম। আহার সারিয়া আমি পত্র লিখিতে বসিয়াছি, সাধনা ও অঞ্জন আহার করিতেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে পুপুন্কী ছাড়িব, রাত্রে থাকিব গোমো। কাল সকাল নয়টায় "কার" নিয়া ছুটিব রাজগৃহের দিকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি ওঁ আটকা (হাজারিবাগ)

৯ই পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

রাত্রিকালটা গোমোতে ছিলাম। সকালে উঠিয়া উপাসনা ও আহার সারিয়া সাড়ে নয়টায় রওনা হইয়াছি রাজগৃহের লক্ষ্যে। পথিমধ্যে তুচ্ছ একটা প্রয়োজনে মোটর হইতে নামিতেই হঠাৎ জানা গেল, টায়ার বিগড়াইয়াছে, বদল করিতে হইবে। গাড়ী এভাবে আটক পড়ার পরে লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গ্রামটীর নাম আটকা। আটকাতেই আসিয়া আটক পড়িয়াছি, খুব ভুল কিছু হয় নাই। সময়টুকু মিথ্যা যাইবে কেন, মটরের পিছনে কাগজ রাখিয়া তোমাকে এই পত্রখানা লিখিতেছি। নূতন টায়ারও পরাণো হইবে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রওনা হইব। যাত্রী আমরা পাঁচজন, আমি, সাধনা, প্রেমাঞ্জন, আমার সহোদরা শ্রীমতী সুরুচিস্নিগ্ধা চক্রবর্ত্তী এবং ড্রাইভার অনিল।

মনে হইল, আটকা নামক গ্রামে আটক পড়ার মধ্যে কি কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাষ আছে? এখানে ছোট-মোট একটা আশ্রম হইলে লম্বা-পাড়ির মোটর-ভ্রমণের একটা বিশ্রাম-স্থানও হয়। স্থানটা দরিদ্র। গরীবের দুঃখ বেশী, অভাব বেশী, রোগ ও অপমৃত্যু বেশী। মানুষকে সেবা দিবার ইহা কি একটা কেন্দ্র হইতে পারে না? অজ্ঞ অন্ধ মূর্খ জনসাধারণের অন্তরে জ্ঞানের আলোক ফুটাইবার পক্ষে ইহা কি একটা কর্ম্মকেন্দ্র হইতে পারে না? আমরা কেবল বড় বড় সহরেই নানা রকমের মন্দির, আশ্রম, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়িব, গ্রামগুলির দিকে তাকাইব না, ইহা কেমন কথা? শহরে শহরে নানা প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য যে বিপুল পরিমাণে শ্রম ও অর্থের নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার শতাংশও পল্লীগুলিতে হয় নাই। পল্লীর দোষ—পল্লীতে শিক্ষিতজনের সমাজ পাওয়া যায় না, দৈনিক পত্রিকা মিলে না, পাঠাগার নাই, ব্যায়ামাগার নাই, নামী ও দামী সুমহৎ লোকদের শুভাগমন নাই, সৎ-সংসর্গ লাভ দুরূহ, সর্ব্বোপরি, পল্লীগুলিতে অতি বিশ্রী রকমের দলাদলি, যাহা প্রতিটি কল্যাণ-কর্ম্মের দারুণ বাধা।

তথাপি পল্লীর প্রতি অবহিত হইতে হইবে। একটা ফাঁকে ছোট্ট গ্রামটুকুর প্রায় সব দেখিয়া নিয়াছি। ছোট্ট স্কুলটী দেখিলাম, প্রধান শিক্ষকের সহিত আলাপও করিলাম। ছোট্ট একটী ছাত্রের সহিত একটু ভাবও জমাইলাম। কলা ও কমলা লেবু প্রসাদ দিয়া গাড়ীটার চারিদিকে বেশ একটু ভিড়ও জমাইয়াছি। এমন সময়ে অনিল বলিল,—উঠুন বাবা গাড়ীতে। সুতরাং বাকী অংশ রাজগীর আসিয়া লিখিব।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

রাজগীর
রাত্রি ৯ ঘটিকা

দুই ঘণ্টা হইল রাজগীরে পৌছিয়াছি। যুবরাজ পাণ্ডার সাহায্যে সহদেব পাণ্ডার বাড়ী উঠিয়াছি। ছোট্ট একখানা ঘরে বিদ্যুতের বাল্ব লাগান হইয়াছে। রান্নার ঘরখানা অন্ধকার। মোমবাতি জ্বালাইয়া রান্না করা হইতেছে। বংশী পাণ্ডা আর শিতল পাণ্ডা খোঁজ নিতে আসিলেন। কারণ, আমি রাজগীরের পুরাতন বাসিন্দা।

সেই পুরাতন কথায় ফিরি।—আটকায় আটকাইলাম কেন? মনে হইয়াছিল, বাল্যকালের ও কৈশোরের সেই একটী আজব কল্পনা কি প্রকারান্তরে রূপ নিতে পারে না? বাঙ্গালী আমরা জন্ম হইতেই স্বদেশের স্বাধীনতার চিন্তা করিয়াছি, ১৯০৫ এরও আগ হইতে। ১৯০৫এ আন্দোলন আসিল কিন্তু বাঙ্গালীর চিন্তা সমগ্র ভারতকে নিয়া। দেশ স্বাধীন করিব, মানে, ভারতকে স্বাধীন করিব, শুধু বঙ্গদেশকেই নহে। তখন কল্পনা করিতাম, কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর হইতে আসার আসামের শেষ রেল-ষ্টেশান ডিব্রু পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মেঘনা নদের তীর হইতে প্রায় তিব্বত-ও চীন-সীমান্ত পর্য্যন্ত সবগুলি রেল-ষ্টেশানের নিকটে, ছয় সাত আট দশ মাইল দূরে দূরে একটী করিয়া আশ্রম করিব। কেমন আশ্রম করিব, তাহা বলিলে অহিংসাবাদী নিরামিষপন্থীদের হৃৎকম্প হইবে। যাহা তাঁহারা ভাবিতে সাহস পান না, তাহা আমরা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমরা চাহিয়াছিলাম অর্জ্জুন আর কর্ণ গড়িতে, ধ্রুব আর প্রহ্লাদ নহে। কিন্তু ভগবৎসাধনের সুগুপ্ত অভীপ্সা এক এক জনকে এক এক দিকে টানিয়া নিয়া গেল, যার যার সংস্কার অনুযায়ী তপঃসাধনে মজিয়া গেলাম, কর্ণ আর অর্জ্জুন গড়িতে পারিলাম

না, অপরেরা আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় দুর্ব্বল এবং যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নিষ্ক্রিয় পুতুল সমূহ সৃষ্টি করিলেন। সেই পুতুলের জয়জয়কারে দিঙ্মণ্ডল আজ মুখরিত।

জীবনের সেই এক অঙ্কের অনেক আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বপ্নটা মুছিয়া যায় নাই। এখনো বারংবার মনে জাগিয়া ওঠে, নদীয়ার বাণপুর হইতে শ্রীহট্টের লাতু পর্য্যন্ত আর ত বোধ হয় জীবনে কখনো যাইতে পারিব না, কিন্তু হাওড়া হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত, বারাণসী হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত, নৈনী হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বড় রাস্তার পাশে পাশে প্রতি পাঁচ দশ পনের বিশ মাইল দূরে দূরে কি একটা করিয়া আশ্রম স্থাপন করা যায় না, যাহা মানবে মানবে প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করিবে, যাহা ভেদবুদ্ধির বিসর্জ্জন করিয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকে জীবসেবার মহনীয় ব্রতে উদ্দীপিত ও দীক্ষিত করিবে? ইহা কি অসম্ভব কিছু? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

রাজগীর (পাটনা)
১০ই পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল ভোরে উঠিয়াই রওনা হইব বারাণসী, এজন্য শ্রীমান্ শ্রীমতীরা জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, আমি রাত্রি এগারটায় তোমাকে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

লিখিতেছি চিঠি। তোমার পত্র ছয় মাস আগে পাইয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়া স্থানের পর স্থান ঘুরিতেছি। রোজই ভাবি, জবাব দিব কিন্তু তার আগেই আরও জরুরী বিশ পঁচিশ খানা পত্র আসিয়া ঘাড়ের উপরে পড়ে।

কন্যার বিবাহ-চিন্তাটাই শুধু করিও না, তাহাকে মানুষ হিসাবে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথাটা তার চেয়ে বেশী চিন্তা কর। যে মানুষ হইল না, সে বিবাহের পরেও তোমার গলগ্রহ হইতে পারে। যে মানুষ হইয়াছে, সে বিবাহিত হইবার পরে নিজ সংসারের সহস্র দায়িত্ব পালন করিয়াও ফাঁকে ফাঁকে পিতৃমাতৃসেবা করিতে পারে। সংসার-সুখের একটা মস্ত উপকরণ আর্থিক সাচ্ছল্য। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে যেখানে সংসারের ধনাগমের সহায়, সেখানে সন্তান-পালনের ও পুত্রকন্যাদিগকে সুশিক্ষাদানের স্বাচ্ছন্দ্য অধিক। সুতরাং কন্যাকে কেবল বিবাহ দিলেই তোমার কর্ত্তব্য পালিত হইল না, তাহাকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তবে বিবাহ দিতে হইবে।

বহুসন্তানের পিতামাতা সন্তানদের প্রত্যেকের প্রতি যত্ন নিতে সমর্থ হন না। এজন্যই দুই তিনটী সন্তানকেই সংসারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু জীবনে সংযম সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে সন্তান-সংখ্যা কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে। ঔষধ, তাবিজ-কবজ, এমনকি আন্ত্রিক প্রক্রিয়াও এই বিষয়ে সকল সময়ে সফলতা আহরণ করে না। সংযম-চেষ্টার মধ্য দিয়া যে সন্তান আসে, সে অপ্রার্থিতও যদি হয়, তবু স্বাভাবিক কতকগুলি অসাধারণত্ব নিয়া আসে, যাহা জাতির ঐশ্বর্য্য, দেশের সম্পদ, জগতের গৌরব। তোমাদিগকে সংযম অভ্যাস করিতে

হইবে। এই অভ্যাসে সিদ্ধকাম হওয়া কঠিন নহে। তোমার বহু ভ্রাতা ও ভগিনী সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সংযমপালন করিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছে ও করিতেছে।

অনেক দিন পরে রাজগীর আসিলাম। এবার এখানে কোনও শান্তি পাইলাম না। ভোগ-বিলাসী মানুষগুলির স্বার্থান্ধ হিংস্র মূর্ত্তি ব্রহ্মকুণ্ডের স্রোতের জলে যেন অধিকতর ক্ষিপ্রতা অর্জ্জন করিয়াছে। রাজগীরে বড় বড় রাস্তা হইয়াছে, বিদ্যুতের আলোক আসিয়াছে, ইতমুখ মানুষদের দুরন্ত ভীড় বাড়িয়াছে। এখানে স্বার্থের দুর্জ্জেয় উগ্রতা ছাড়া আর কি দেখা যাইবে? আসিয়াছিলাম এখানে একটা স্থায়ী আশ্রম করা যায় কি না, তাহার ধারণা নিয়া। কিন্তু যেখানে স্নানের জন্য অর্দ্ধ মিনিট, অর্থাৎ কর গণিয়া ত্রিশ সেকেণ্ড, সময়ের জন্য উষ্ণধারা পাইতে হইলে সাত বার সিং বাঁকাইয়া মানুষকে গুঁতাইতে হইবে, সেখানে ভদ্র মন শুদ্ধ প্রাণ কোন্ দুঃখে আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িবে? জোর করিয়া যদি পরমেশ্বর রাজগীরে আশ্রম করিয়া দেন, তবেই আশ্রম করিব। নতুবা, এবারই বিদায়।

তীর্থস্থানগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল মহতের ত্যাগে, তপস্বীর সাধনায়। বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া এগুলির পুষ্টি। সেইখানে যদি স্নান করিতে গিয়া গুণ্ডামি করা ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে এখানে আমাদের আসিয়া কাজ নাই।

ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করিয়া মানুষগুলি স্নান করিতেছে। কত মাতা আর কত ভগিনীর ঘাড়ের উপরে পড়িয়া ইহারা অসভ্যতার চূড়ান্ত

দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও মানুষের মনে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সম্ভ্রম-বোধ দেখা যাইত, আজ তাহার এক কণাও অবশিষ্ট নাই কেন? কে এই জাতিটার এমন অধঃপতন ঘটাইল?

জীবনের মান উন্নত করিলে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বর্দ্ধিত করিলেই জাতি সভ্য হয় না। সভ্যতার জন্য সংযম চাই, শালীনতা চাই, সম্ভ্রম চাই। সভ্যতার জন্য উগ্র স্বার্থবোধকে খর্ব্বিত করা চাই। দিনের পর দিন আমরা মানুষ হইতেছি না বন-মানুষ সাজিতেছি?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু একদা এখানে আসিয়াছিলেন। উষ্ণ ধারার জল পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এ জলে র‍্যাডিয়াম আছে, ইহা স্বাস্থ্যপ্রদ। স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় সুরু হইল। সম্প্রতি বিহার-সরকার প্রচারের মাধ্যমে রাজগীরকে আরও খ্যাতি দিয়াছেন। ফলে দীর্ঘজীবন লাভের লোভীরা দলে দলে আসিতেছে। কিন্তু কতক-অসভ্য, অসংস্কৃত, আত্মস্বার্থপরায়ণের দীর্ঘজীবন লাভের দ্বারা দেশ ও জগতের কি লাভ হইবে? তাহারাই দীর্ঘায়ু হউক, যাহাদের জীবন পরার্থে।

আগে আসিত মানুষ ধর্ম্মবুদ্ধিতে। তাই উষ্ণধারার জলটুকু ভক্তি সহকারে মাথায় ছোঁয়াইত, স্নান করিয়া এক যুগের পাপ যেন পাষাণ-ভার নিয়া চিরতরে নামিয়া গেল বলিয়া এক অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিত, ক্ষণকালের স্নানে অনেক পূর্ব্বসংস্কার ও দুর্ব্বলতার কবল হইতে মুক্ত হইত। এখন আসিতেছে অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজে দীর্ঘ সময় উষ্ণধারার সুখানুভব করিবার জন্য, দুর্ব্বলকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া নিজের পেশল বাহুর আস্ফালনে অন্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার জন্য। কি নিদারুণ ও দুঃখকর এই পরিণতি!

জাতির সর্ব্বাঙ্গ গলিত ক্ষতে ভরিয়া গয়াছে। কে সেই রাজর্ষি অশোক, যিনি সমগ্র জাতির ভিতরে নৈতিক মূল্যবোধ জাগাইবার জন্য নিজের চরিত্র হইতে সর্ব্বাগ্রে হিংসার চণ্ডতা দূর করিয়া দিবেন এবং দুর্নীতির নাগ-পাশ হইতে সকলকে মুক্তি দিবেন? জনসাধারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে আজ ত রাজপুরুষেরা বিরক্ত হন। তাঁহারা বলেন, দুর্নীতি সকল দেশেই আছে।

সুতরাং জাতিকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের হাতে নিতে হইবে। প্রত্যেকটী বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটী বালকের কর্ণে ব্রহ্মচর্য্যের মহামন্ত্র প্রবেশ করাও। এই এক মূলমন্ত্র হইতে ভারতের ভাবী অভ্যুদয়ের মহামহীরুহ আত্মবিস্তার করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

বারাণসী

১২ই পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল রাত্রি সাড়ে দশটায় বারাণসী পৌছিয়াই তোমার পত্রখানা সকলের আগে হাতে পড়িল। চিরজীবনই কেবল হাহাকার করিয়া মরিতেছ। এভাবে প্রত্যহ একবার করিয়া মরিতে থাকিলে মৃত্যুর আর কোনও সম্মান থাকিবে না। বাঁচিবার জন্য একটু চেষ্টা করিয়া দেখ।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

নিজ নিজ দুঃখ-দুর্ভাগ্যের চিন্তা পরিহার করিয়া সকলের জন্য কিছু কিছু কাজ করিতে অভ্যাস কর। জীবনে নিজের দুঃখের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই কি কহিবে না?

পরের দুঃখ-বিদূরণের জন্য কিছু কিছু কাজের অভ্যাস করিলে দেখিবে, নিজের দুঃখ সম্পর্কে অত্যধিক কাতরতা আস্তে আস্তে দূর হইয়া যাইতেছে। দুঃখ নিজে যত দুঃখদ, দুঃখ-কাতরতা তার চেয়ে সহস্র গুণ দুঃখপ্রদ। দুঃখকে যুদ্ধ দিয়া জয় করিতে হইবে, আর্ত্তনাদ করিয়া নহে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। নিয়ত তাঁহার নাম স্মরণ কর। সর্ব্বক্ষণ নিজেকে তাঁহার আশিসে সিক্ত বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা কর। জগতে দুঃখ কে পায় নাই? ধ্রুব-প্রহ্লাদকে দুঃখ পাইতে হয় নাই? হারুণ-অল-রশিদ বা বিক্রমাদিত্য দুঃখের মুখ দেখেন নাই? জুলিয়াস সীজার বা চেঙ্গিস খাঁ দুঃখের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিলেন? নেপোলিয়ান বা আলেকজাণ্ডার কখনো দুঃখ চাখিয়া দেখেন নাই? বুদ্ধ কিম্বা নানক জীবনে কখনো দুঃখানুভব করেন নাই? কিন্তু প্রকৃত বীরেরা দুঃখকে নিজের দুঃখমাত্রে থাকিতে না দিয়া বিশ্বজনের দুঃখ বিদূরণের উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

পরের দুঃখ দূর করিতে গেলে নিজের দুঃখ থাকে না। তুমিও পরের দুঃখ নিয়া ভাবিতে থাক। তোমার চেয়ে বেশী দুঃখীরা কে কোথায় কেমন ভাবে আছে, তাহার অনুসন্ধানে লাগিয়া যাও। তাহাদের দুঃখ দূর করিবার তোমার সামর্থ্য না থাকে, না থাকুক, দূর করিবার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিতে বাধাই বা কি, অসুবিধাই বা কোথায়?

যাহা লিখিলাম, তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিও। প্রত্যেকটী বাক্য অনুসরণ করিতে যত্ন নিও। অল্প কয়েকদিন পরেই দেখিবে, দুদিন আগেও যে দুঃখ তোমাকে ঝঞ্ঝা-তাড়নে উৎক্ষিপ্ত করিতে প্রয়াসী হইত, সে পোষা কুকুরের মত তোমার পদতল-সেবী হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

বারাণসী

১৩ই পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে নামো। তোমাদের যে কত শক্তি, তাহা কাজে নামিলেই টের পাইবে। তোমরা যে অক্ষম নহ, দুর্ব্বল নহ,—তোমাদের মধ্যে এই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হউক।

আত্মবিশ্বাস লইয়া কাজ কর। আত্মবিশ্বাস স্বল্পশক্তি ব্যক্তিকেও অমিতশক্তিধর করে। অহঙ্কার শক্তিমানেরও পতনের কারণ হয়। অহঙ্কার বর্জ্জন করিও। অহঙ্কার-বর্জ্জিত আত্মবিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। তাহাকে ভবদ্বিশ্বাসের রূপান্তর বা নামান্তর বলিতে পার। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, জগতে তাহার অসাধ্য কি?

ঈশ্বরে বিশ্বাস আর অদৃষ্ট-নির্ভরতা এক কথা নহে। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানুষকে কর্ম্মঠ করে, অদৃষ্ট-নির্ভরতা কর্ম্মবিমুখ করে। ঈশ্বর-বিশ্বাস ঈশ্বর-প্রেমেরই শুভময় ফল অথবা ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতেই ঈশ্বর-প্রেমের সৃষ্টি হয়। দুইটী কথাই সমান সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

বারাণসী
২০শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা এক অকারণ সমস্যায় পড়িয়াছ। অর্থাৎ, যাহা আদৌ সমস্যাই নহে, তাহাকে এক অতি সাংঘাতিক সমস্যা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছ।

শ্রীমান গ— তাহার কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছে। সে নিজে কায়স্থ-সন্তান কিন্তু পাত্র নমঃশূদ্র-বংশজাত। আমার নিকটে বিবাহের অনুমতি চাওয়ায় আমি অনুমতি দিয়াছি। শ্রীমান গ— চাহিয়াছিল বিবাহটী অখণ্ড-মতে সম্পাদন করিতে। কিন্তু মণ্ডলীতে তোমাদের এই বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে। একদল মনে করিয়াছ, অখণ্ড-বিবাহ হইবে, ভালই ত, হউক। অপর দল বলিয়াছ,—না, তাহা হইতে পারে না; এভাবে অসবর্ণ বিবাহ সমূহ অখণ্ড-মতে হইতে থাকিলে অখণ্ড-সমাজ সাধারণ হিন্দু সমাজের নিকটে নিন্দনীয় হইবে; সুতরাং বিবাহ কৌলিক মতে হউক।

শেষোক্তদের মত প্রবল হওয়ায় তোমাদের সকলের বিশেষ সহযোগিতায় কন্যাদাতার কন্যাদান কৌলিক মতে হইয়াছে। সুখের বিষয়, কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পৌরোহিত্য করিয়াছে তোমাদেরই ভ্রাতা শ্রীমান অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়। ভাল কাজ করিয়াছে। দুইটী আগ্রহী প্রাণকে একত্র মিলাইয়া দিয়া শ্রীমান্ অমৃত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে।

যে মতেই হউক, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন তোমরা নব-দম্পতীকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ কর। তাহাদের জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়, তৃপ্তিময়, অনাময় এবং সুদীর্ঘ হউক। তাহাদের মিলন জগতের হিত-সম্পাদন করুক। তাহাদের দ্বারা জগন্মঙ্গল-সাধনার ধারাবাহিকতা বর্দ্ধিত হউক।

তোমাদের বিচারে একটু ভুল আছে। অখণ্ড-মতে বিবাহ কাহাদের হইবে? যাহারা প্রচলিত মতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহে। এই অনিচ্ছা নানা কারণে হইতে পারে। কৌলিক মতের বিবাহে ব্যয় অত্যধিক, অখণ্ড-মতে বিবাহে ব্যয় অতি সামান্য। কৌলিক মতের বিবাহে নানা দেবতার অর্চ্চনা হয়, অখণ্ড-মতের বিবাহে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও আরাধনা নাই। কৌলিক বিবাহের প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার অসুন্দর ও অমার্জ্জিত, অখণ্ড-মতে বিবাহে বিন্দুমাত্র কুরুচির প্রবেশাধিকার নাই। কৌলিক মতের বিবাহে বর, কন্যা, কন্যাদাতা ও পুরোহিতই সক্রিয়, অন্যান্যেরা দর্শক মাত্র কিন্তু অখণ্ড-মতের বিবাহে প্রত্যেকটী দর্শকও একটী করিয়া উপাসক,—ফলে সমগ্র বিবাহ-বাসরটী একটী ঋষি-তপোবনের মতন সাত্ত্বিকতায় উচ্ছলিত হইতে থাকে। এই সকল কারণেই কেহ কেহ অখণ্ডমতের

বিবাহের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত। টাটানগর, টালিগঞ্জ, বরাহনগর, নোয়াখালী আদি নানা স্থানে যে সকল অখণ্ডমতের বিবাহ হইয়াছে, প্রত্যেকটীর দর্শকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা এক আদর্শ পদ্ধতি, এক চমৎকার পথ। অখণ্ডমতে অসবর্ণ বিবাহ হইতে পারিবে না, তাহা নহে। বর-কন্যার পিতামাতার যেখানে সম্মতি নাই, অখণ্ড-মতে বিবাহ সেখানে সবর্ণেও হইতে পারে না কিন্তু বরকন্যার পিতামাতা-অভিভাবকদের সম্মতি থাকিলে অসবর্ণ বিবাহও অখণ্ডমতে হইতে পারে, হইতেছে। সুতরাং তোমরা এই বিবাহটী অখণ্ড-মতে দিলে কোনও অন্যায় হইত না। তবে, কৌলিক মতে হইলেও, বিবাহ ত হইয়াছে। এস, আমরা নবদম্পতীকে প্রাণ-ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করি। ইহাদের বিবাহ সর্ব্বজনকুশলকারী হউক, ইহাদের বিবাহ জগতের দুঃখরাশি বিদূরণের সোপানস্বরূপ হউক; ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের গতি নহে, বিশ্বজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের গতিবৃদ্ধির ইহা সহায়ক হউক।

বৃথাই তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ যে, অসবর্ণ বিবাহটী অখণ্ড-মতে হইলে অখণ্ড-সমাজের উপরে হিন্দু-সমাজের কুদৃষ্টি পড়িত। কয়েকজন প্রাচীনপন্থী প্রবীণ ব্যক্তির মনে আঘাত লাগিত, ইহা সত্য। কয়েকজন সনাতনী ধ্বজাধারী উদ্ধত যুবক ক্রুদ্ধ আস্ফালন করিত, ইহাও সত্য। কিন্তু দুই দিন পরেই ইঁহারা থামিয়া যাইতেন। সহস্র সহস্র সতী রমণী যেদিন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে ধর্ষিতা হইয়া আর্ত্তচীৎকারে আর আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় সুপারি বাগান আর নারিকেল-বন লণ্ডভণ্ড করিতেছিলেন, তাঁহাদের উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেদিন অর্দ্ধজলনিমগ্ন পাটক্ষেতের আগাগুলি পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইতেছিল, সেদিন ইঁহাদের কয়জনে সেখানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, চিন্তাদের সম্মান রক্ষা

করিতে? এই রকমের ঘটনার মুখে যাঁহারা জড়তা ও কাপুরুষতা পরিহার করিতে পারেন না, তাঁহারা তোমাদিগকে এমন বাধা কদাচ দিতে পারিবেন না, যাহা তোমাদের কল্যাণপ্রয়াসকে ম্লান করিতে পারে।

আসল বিপদটা অন্যত্র।

ভাল হউক আর মন্দ হউক, জাতিভেদ-প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র অতীব বদ্ধমূল। এমন বদ্ধমূল যে, জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নূতন একটী জাতি বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন, ইহার অতিরিক্ত কিছু করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত—ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ইত্যাদি। জাতিভেদ-প্রথা এদেশে এমন বদ্ধমূল যে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়া যখন খ্রীষ্টান মিশনরীরা নদীয়া জেলার কয়েক সহস্র বাঙ্গালীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, তখন পুরাতন খ্রীষ্টানেরা নবদীক্ষিতদের সহিত আহার করিতে বা পুত্র-কন্যার বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। রোমান ক্যাথলিক মিশন সমূহ নবদীক্ষিতদিগকে তাঁহাদের প্রাক্তন জাতির আচার ও সংস্কার বজায় রাখিতে দিয়া থাকেন, কিন্তু অ্যাংগ্লিকান বা অন্যান্য প্রটেষ্টাণ্ট মিশন সমূহে এই বিষয়ে কোনও প্রশ্রয় নাই। কিন্তু তাঁহারাও ভারতীয় উচ্চবর্ণ হইতে গৃহীত খ্রীষ্টানদিগকে এই নির্দ্দেশ পালন করাইয়া উঠিতে পারেন নাই। একত্র-ভোজনের আপত্তি কোনও প্রকারে কেহ কেহ ট্যাকে ভাঙ্গিয়া রাখিতে পারিলেও বিবাহের বেলায় তাহাদিগকে সম্মত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইসলামধর্ম্ম যে দেশে গিয়াছে, সে দেশেই সব জাতি সব বর্ণ ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে কিন্তু ভারতে "আজলাফ" মুসলমানেরা "আশরাফ" মুসলমানদের কন্যা

বিবাহ করিবার সাহস রাখে না। জোল্‌হা, ধুনিয়া, কুলু, দর্জ্জি, হাজ্জাম, কুঞ্জ্‌রা প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলমানেরা "আজলাফ্"। আর মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশীদের বংশধর এবং উচ্চকুলের ধর্ম্মপরিত্যাগকারী হিন্দুদের বংশধরেরা "আশরাফ"। একশ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক আদান-প্রদান সহজে হইবার নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। জাতিভেদের বা বর্ণভেদের এই ধারণাগুলি খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা এই দেশের মাটি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে ধর্ম্ম আমদানী করিয়াছেন কিন্তু এদেশের সমাজ-গঠনের কাঠামো অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বদ্ধমূল জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সন্তানদের মধ্য হইতে বিদূরণের চেষ্টা হইলে সমাজ হইতে বাধা আসিবে, নিন্দা হইবে, ধিক্কার-ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিবে,—ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা আসল বিপদ নহে। আসল বিপদ অন্যত্র।

পৃথিবীতে যখন একটী খ্রীষ্টানের বা একটী মুসলমানেরও জন্ম হয় নাই, সেই দিনও ভারতে অসবর্ণ বিবাহ চলিয়াছে। কি ভাবে চলিয়াছে? না, ব্রাহ্মণ বর একটী ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণের পরে ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, শূদ্রকন্যাকে অবহেলে বিবাহ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বর একটী ক্ষত্রিয়-কন্যার পাণিপীড়নের পরে বৈশ্যকন্যা শূদ্র-কন্যাকে অনায়াসে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশ্য বর একটী বৈশ্যকন্যাকে অঙ্গীকার করিবার পরে নির্ব্বিঘ্নে শূদ্রকন্যার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। অর্থাৎ বিবাহ চলিয়াছে অনুলোমে। আপত্তি হয় নাই। উচ্চবর্ণের কন্যাকে নিম্নবর্ণের পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে গেলেই যত আপত্তি।

কারণ কি? বিবাহিতের সংসারে পুরুষের চরিত্র সামাজিক দিক দিয়া প্রধান, নারীর চরিত্র আংশিক অপ্রধান। ভূমিকার এই পার্থক্যের দরুণ বিবাহের পরে কন্যা পতিগৃহে যায়, পতি আসিয়া কন্যার ঘরে বাস করে না। কন্যা তাহার স্বাভাবিক সামর্থ্যের দরুণ নিজেকে পতির সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নেয় কিন্তু পতি নিজেকে কন্যার সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে না। নিম্নবর্ণের কন্যা উচ্চবর্ণের ঘরে গেলে সে উচ্চতর সংস্কার সমূহ দ্রুত গ্রহণ করিয়া ফেলে, আর তাহার পতিকে শত পরিজনে উচ্চতর সংস্কার সমূহে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু উচ্চবর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণের ঘরে গেলে তাহাকে বাধ্য হইয়া নিম্নতর সংস্কার সমূহ গ্রহণ করিতে হয়, নিম্নকুলে উচ্চতর অবদান দিবার সুযোগ তাহার খুব অল্পই হইবার সম্ভাবনা। বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য বংশবৃদ্ধি, মানসিক উদ্দেশ্য সুখানুভব, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অভিন্নতার উপলব্ধি, সামাজিক উদ্দেশ্য বংশের উন্নতিমুখিনী প্রবণতার শ্রীবৃদ্ধিসাধন। উচ্চবর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণে গেলে এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যসাধন দুরূহ হইয়া পড়ে। এজন্যই শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের ঘরণী হইয়া অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের প্রসবিত্রী হইয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রের ঘরণী হইয়া যাহাকে প্রসব করিয়াছেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই।

অসবর্ণ-বিবাহ মাত্রেই আর একটী বিপদ আছে। তাহা হইতেছে এই যে, যে দুইটী পরিবার স্বাভাবিক ভাবে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা করিতে অসমর্থ, তেমন দুই ঘরের ছেলে ও মেয়ের বিবাহ হইবার পরে সন্তান-সন্ততিগুলি অবাধ আত্মীয়তার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে একটা লাঞ্ছনা। উচ্চবর্ণের পুত্র নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলে উচ্চবর্ণের সকল আত্মীয় হইতে বরটীকে একঘরে হইয়া বাস

বিবাহ করিবার সাহস রাখে না। জোলহা, ধুনিয়া, কুলু, দর্জ্জি, হাজ্জাম, কুঞ্জরা প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলমানেরা "আজলাফ্"। আর মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশীদের বংশধর এবং উচ্চকুলের ধর্ম্মপরিত্যাগকারী হিন্দুদের বংশধরেরা "আশরাফ"। একশ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক আদান-প্রদান সহজে হইবার নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। জাতিভেদের বা বর্ণভেদের এই ধারণাগুলি খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা এই দেশের মাটি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে ধর্ম্ম আমদানী করিয়াছেন কিন্তু এদেশের সমাজ-গঠনের কাঠামো অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বদ্ধমূল জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু-সন্তানদের মধ্য হইতে বিদূরণের চেষ্টা হইলে সমাজ হইতে বাধা আসিবে, নিন্দা হইবে, ধিক্কার-ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিবে,—ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা আসল বিপদ নহে। আসল বিপদ অন্যত্র।

পৃথিবীতে যখন একটী খ্রীষ্টানের বা একটী মুসলমানেরও জন্ম হয় নাই, সেই দিনও ভারতে অসবর্ণ বিবাহ চলিয়াছে। কি ভাবে চলিয়াছে? না, ব্রাহ্মণ বর একটী ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণের পরে ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, শূদ্রকন্যাকে অবহেলে বিবাহ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বর একটী ক্ষত্রিয়-কন্যার পাণিপীড়নের পরে বৈশ্যকন্যা শূদ্র-কন্যাকে অনায়াসে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশ্য বর একটী বৈশ্যকন্যাকে অঙ্গীকার করিবার পরে নির্ব্বিঘ্নে শূদ্রকন্যার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। অর্থাৎ বিবাহ চলিয়াছে অনুলোমে। আপত্তি হয় নাই। উচ্চবর্ণের কন্যাকে নিম্নবর্ণের পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে গেলেই যত আপত্তি।

কারণ কি? বিবাহিতের সংসারে পুরুষের চরিত্র সামাজিক দিক দিয়া প্রধান, নারীর চরিত্র আংশিক অপ্রধান। ভূমিকার এই পার্থক্যের দরুণ বিবাহের পরে কন্যা পতিগৃহে যায়, পতি আসিয়া কন্যার ঘরে বাস করে না। কন্যা তাহার স্বাভাবিক সামর্থ্যের দরুণ নিজেকে পতির সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নেয় কিন্তু পতি নিজেকে কন্যার সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে না। নিম্নবর্ণের কন্যা উচ্চবর্ণের ঘরে গেলে সে উচ্চতর সংস্কার সমূহ দ্রুত গ্রহণ করিয়া ফেলে, আর তাহার পতিকে শত পরিজনে উচ্চতর সংস্কার সমূহে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু উচ্চবর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণের ঘরে গেলে তাহাকে বাধ্য হইয়া নিম্নতর সংস্কার সমূহ গ্রহণ করিতে হয়, নিম্নকুলে উচ্চতর অবদান দিবার সুযোগ তাহার খুব অল্পই হইবার সম্ভাবনা। বিবাহের শারীরিক উদ্দেশ্য বংশবৃদ্ধি, মানসিক উদ্দেশ্য সুখানুভব, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অভিন্নতার উপলব্ধি, সামাজিক উদ্দেশ্য বংশের উন্নতিমুখিনী প্রবণতার শ্রীবৃদ্ধিসাধন। উচ্চবর্ণের কন্যা নিম্নবর্ণে গেলে এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যসাধন দুরূহ হইয়া পড়ে। এজন্যই শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণের ঘরণী হইয়া অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের প্রসবিত্রী হইয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রের ঘরণী হইয়া যাহাকে প্রসব করিয়াছেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই।

অসবর্ণ-বিবাহ মাত্রেই আর একটী বিপদ আছে। তাহা হইতেছে এই যে, যে দুইটী পরিবার স্বাভাবিক ভাবে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা করিতে অসমর্থ, তেমন দুই ঘরের ছেলে ও মেয়ের বিবাহ হইবার পরে সন্তান-সন্ততিগুলি অবাধ আত্মীয়তার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে একটা লাঞ্ছনা। উচ্চবর্ণের পুত্র নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলে উচ্চবর্ণের সকল আত্মীয় হইতে বরটীকে একঘরে হইয়া বাস

করিতে হয়। নিম্নবর্ণের পুত্র উচ্চবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলে উচ্চবর্ণের সকল আত্মীয় কর্ত্তৃক কনেটীকে নির্ব্বাসিত হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। ইহার মনস্তাত্ত্বিক কুফল কিছু কম নহে।

তথাপি তোমাদের ওখানে অসবর্ণ বিবাহই হইয়াছে। অথণ্ডমতেই কর আর কৌলিক মতেই কর, বিবাহ বিবাহই। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, জৈন, ব্রাহ্ম, শিখ আদি যে মতেই বিবাহ হইয়া থাকুক, যদি কন্যাকে ছলনা করিয়া বা তাহার উপরে বলপূর্ব্বক কিম্বা নানা দুর্ঘটনা সৃষ্টি করিয়া বিবাহটী না হইয়া থাকে, তবে সব বিবাহই বিবাহ। নব-বিবাহিতকে আশীর্ব্বাদ করাই বিধেয়।

তবে, হাঁ, গান্ধর্ব্ব বিবাহকে আমি বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করি না, তোমরাও করিও না। উহাকে যুবজনের সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত আচরণ বা ভ্রম বলিয়া মানিয়া নিয়া এরূপ ভ্রান্তপথে বিচরণকারীদিগকে পুনরায় সঙ্গত নিয়মে বিবাহিত হইতে দেওয়া উচিত অথবা ভিন্ন ভিন্ন কন্যা ও পাত্র দেখিয়া তাহাদিগকে বিবাহিত ও পাত্রস্থা করা উচিত।

নিম্নতর বর্ণে যাহারা পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে উচ্চ-সংস্কার-সম্পন্ন করিয়া তুলিবার কাজে তোমরা প্রত্যেকে আত্মনিয়োগ কর। নিম্ন-তরকে ঘৃণা করিয়া, বর্জ্জন করিয়া, দূরে রাখিয়া কোনও সুফল হইবে না বরং দেশব্যাপী শূদ্রের তাণ্ডব সৃষ্টি করা হইবে। মানুষ মাত্রকেই মানুষ জানিয়া মানুষের যোগ্য প্রত্যেকটী উচ্চাধিকারের সুযোগ দিতে হইবে। আই-সি-এস পাশ করিলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পাইলেই শূদ্র উচ্চাধিকারিত্ব পাইল না, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ সংস্কার, উচ্চ

উপলব্ধি, উন্নত ধরণের জীবনযাপন-প্রণালী, পরার্থে আত্মদান এবং সর্ব্ব-জনসুখতরে জীবনধারণ যাহার আয়ত্তে, সে-ই প্রকৃত উচ্চাধিকারী। বড় চাকুরী পাইয়া ছোট ঘরের ছেলেরা সম্মানিত ও পূজ্য ব্যক্তির ঘাড়ের উপরে পা তুলিয়া দিয়াছে, এমন দৃশ্য আমিও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। হঠাৎ ধনী হইয়া নিম্নবর্ণের ছেলেরা পূজ্যপাদ পুরুষদিগকে কৌশলে নিজের পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন ঘটনাও আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। বিদ্যার গর্ব্বে জল-অচলের পুত্র গ্রামের পুরোহিতকে সর্ব্বসমক্ষে অসম্মান করিয়া আত্ম-গৌরব অনুভব করিয়াছে, এমন ব্যাপারের কথাও বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি। এই চাকুরী, এই ধন, এই বিদ্যা উচ্চতালাভের পরিচায়ক নহে। যথার্থ যাহা উচ্চতা, তাহা প্রতিটী মানুষের মধ্যে আসুক। উচ্চতার ভান দিয়া নিজের ভিতরের নীচতাকে লুক্কায়িত রাখিবার কূটকৌশলকে উচ্চতা বলে না।

সমাজের সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধানের জন্য তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের শরণাপন্ন হও। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যাও দিবে, বিনয়ও দিবে। ব্রহ্মচর্য্য পৌরুষও দিবে, অধিকারও দিবে। ব্রহ্মচর্য্য সমতাও দিবে, ক্ষমতাও দিবে। ব্রহ্মচর্য্য উন্নত উপলব্ধি দিবে, পরার্থে আত্মদানের সামর্থ্য দিবে। ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বালিঙ্গনকারী আত্মীয়তা দিবে, শ্রদ্ধেয় জনকে শ্রদ্ধা করিবার রুচি, শক্তি ও অনুশীলন দিবে। যাহা-কিছু মঙ্গলজনক, ব্রহ্মচর্য্য সব-কিছু দিবে। ব্রহ্মচর্য্য নির্য্যাতিতের মানসিক উগ্রতা নাশ করিবে, নির্য্যাতন-কারীর কাপুরুষতা দূর করিবে। ব্রহ্মচর্য্য অন্তরভরা প্রেম দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

বারাণসী

২৪শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কি সংসারে, কি আশ্রমে, সহিষ্ণুতা অর্থাৎ অপরের অল্পাধিক অবিচার সহিয়া যাইবার শক্তি সর্ব্বদাই আবশ্যক। পৃথিবীর প্রত্যেকটী লোক প্রতি ব্যাপারে নিক্তির ওজনে কর্ত্তব্য মাপিয়া সকলের প্রতি সমব্যবহার করিতে পারিবেই পারিবে, এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। কেহ তোমার উপরে কিছু অবিচার যেন করিয়াছে। তুমি যদি তাহার প্রতিকারের জন্যই নিজেকে নিয়োগ কর, তাহা হইলে তোমার হস্তে ন্যস্ত গুরুতর কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদনে বিঘ্ন বা বিলম্ব হইবে। তবে, যেখানে ক্ষুদ্র অবিচার উপেক্ষিত হইবার ফলে বৃহৎ অবিচারের ইন্ধন যোগাইয়াছে, সেখানে অবিচারের অনুচিত প্রভুত্বের অবসান সাধনের জন্য কাজ করা সত্যই আবশ্যক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের একশত একটী অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তটী প্রেরণাদায়ক।

কাণ-কথা শুনিবার অভ্যাস বা লোকের লাগান কথায় বিশ্বাস করিয়া ক্লিষ্ট বা উত্তেজিত হওয়া আর একটী কর্ম্মবিঘ্নকর ব্যাপার। তোমার অসাক্ষাতে কেহ যদি তোমার সম্পর্কে কোনও ভাল বা মন্দ কথা বলিয়া থাকে, বলুক। তাহাতে হৃষ্ট বা রুষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। যে তোমার অসাক্ষাতে তোমার প্রশংসা করিয়াছে, সে ভালই করিয়াছে, প্রশংসা সাক্ষাৎসত করা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে শ্রোতার

অহঙ্কার বাড়ে। যে তোমার অসাক্ষাতে তোমার নিন্দা করিয়াছে, সে ত দুনিয়ার এক নিকৃষ্ট কাপুরুষ। সাহসী পুরুষ হইলে সে তোমার সাক্ষাতেই তোমার অপ্রিয় সমালোচনা করিতে পারিত। একটা কাপুরুষের কদর্য্য কথায় তোমার কি আসে যায়?

একজনের কথা আর একজনের নিকট আসিয়া বলাও অতীব কুৎসিত অভ্যাস। দুই দিনের জন্য আশ্রমের কর্ম্মী রূপে আসিয়া কেহ কেহ এই বিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছে। ইহারা দু-দিনের কর্ম্মী, ছুটি ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরিয়াছে কিন্তু যাহারা স্থায়ী কর্ম্মী, তাহাদের মধ্যে গভীর মনোমালিন্যের দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা রচনা করিয়া গিয়াছে। সংসারেও দেখা যায়, অনেক কুটিলা রমণী আত্মীয় বাড়ীতে "নাইয়র" করিতে আসিয়া বধূতে বধূতে কলহের পত্তন করিয়া দিয়া যায়। আশ্রমে বা সংসারে ইহাদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু কাণ-কথা শুনিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ভিতরে ইহার প্রতিষেধ আছে।

অনেক সংসারে বা অনেক প্রতিষ্ঠানে এরূপ লোক দেখা যায়, যাহারা দৈবক্রমে ক্ষমতার আসনে বসিয়া গিয়াছে এবং নিজেদের ক্ষমতার মেয়াদ বাড়াইবার অভিলাষে আশ্রমের বা সংসারের আর্থিক ক্ষতি করিয়া চারিদিকে বদান্যতার বাহার ফুটাইতে থাকে। সংসার বা প্রতিষ্ঠানটীকে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করিবার দিকে ইহাদের দৃষ্টি থাকে না, দৃষ্টি থাকে সহকর্ম্মী বা সমকর্ম্মীদের মধ্যে নিজেকে লোকদৃষ্টিতে অতি প্রধান করিয়া রাখিবার জন্য যাহার যাহা প্রাপ্য নহে, তাহাকে তাহা দেওয়ার চেষ্টায়, যাহার অল্প প্রাপ্য, তাহাকে অধিক দিয়া

অনুগৃহীত করার চেষ্টায়। সংসার বা প্রতিষ্ঠানটী যে এইরূপ কার্য্য দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা হারাইতেছে, এই দিকে ইহাদের দৃষ্টি থাকে না এইরূপ স্থলে সংসার বা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইবার জন্য ঝগড়া-কলহের ঝুঁকি নিয়াও অনুচিত বদান্যতা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত। অনুচিত রাজনৈতিক বদান্যতা ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামে কোথায় কোন্ দুর্ব্বলতা, পরাজয় এবং অপসম্ভাবনার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে তোমাদের নিজ নিজ সংসারে বা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় অপচয় নিবারণের বিষয়ে স্বভাবতই উৎসাহিত হইবে। অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটী বা ব্যক্তিরা প্রকৃত হিতকর একটী কার্য্য কিছুতেই করিবেন না, সহকর্ম্মী বা সহকর্ম্মীদের চাপে পড়িয়া কাজটী করিতে বাধ্য হইলেন। যখন দেখা গেল যে কাজটীর জন্য প্রশংসা হইতেছে, তখন ইনি বা ইহারা আগাইয়া আসিলেন কেরদানির জন্য বাহাদুরী নিতে। ইহা চরিত্রের দুর্ব্বলতা এবং মিথ্যাচার ব্যতীত কিছুই নহে। "যত ভাল কাজ সব আমিই করিয়াছি" বলিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইবার ভিতরে আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রতারণা দুইটাই সমভাবে রহিয়াছে। প্রবঞ্চক ও প্রতারক কদাচ মহৎ সম্মান লাভের যোগ্য হয় না, মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারে না। তবু এই জগতে অনেক দুষ্ট ও অসৎ লোক কল্পনাতীত যশ অর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপ যশকে তোমরা বিষ্ঠাস্তূপের ন্যায় বর্জ্জন করিয়া চলিও, নাসাগ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ইহার দুর্গন্ধ যাহাতে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিও। পরের কাজকে নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা যাহারা করে, তাহারা কৃপার পাত্র।

তোমার সংসারে বা তোমার আশ্রমে তোমার শ্রম বা কৃতিত্বকে নিজের কৃতিত্ব বলিয়া চালাইয়া দিয়া কেহ যদি ক্ষণভঙ্গুর যশ অর্জ্জন করে, তবে তাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। কুকুরকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেও সে জুতাই কামড়াইবে, রাজভোগের প্রতি দৃষ্টি দিবে না। যে সত্যই মহৎ নহে, তাহার মহত্ত্বের ভান স্বল্পকাল বাঁচে। যাহারা পরের টাকা জলের মত খরচ করিয়া মানুষের কাছে মাতব্বরী করে, একদা তাহাদিগকে বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া নিজেদের নগ্ন মূর্ত্তি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে হয়। সংসারে বা আশ্রমে তোমরা প্রতিজনে কেবল লক্ষ্য রাখ কাজে। কাজ কতটুকু আগাইল, তার জন্যই ব্যাকুল থাক। তোমার বরং যশ নাই হইল, কিন্তু সকলের শ্রমে সংসারটী বা আশ্রমটী একটী সমৃদ্ধির আগারে, একটী শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হইয়াছে ত? ইহাতেই তোমার সন্তোষ, ইহাতেই তোমার আত্মপ্রসাদ হউক। সংসারই বল আর আশ্রমই বল, এগুলি প্রত্যেকটীই এক একটী যৌথ প্রতিষ্ঠান। ইহার মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্বও যৌথ ভাবে তোমাদের প্রত্যেকের।

আত্মকলহপরায়ণতা বর্ত্তমান সময়ে দেশের প্রায় সকল লোকের এক স্বাভাবিক বিশেষত্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বার্থপরতা এবং দূরদৃষ্টি-হীনতা ইহার প্রধান কারণ। স্বার্থপরেরা বোঝে না যে, স্বার্থপরতার হ্রাস ঘটাইতে পারিলেই পরিণামে অধিক পরিমাণে স্বার্থসাধন হইতে পারে। দূরদৃষ্টিহীনেরা বোঝে না যে, আজ যাহা করিতেছি, তাহা কল্যকারই জন্য, পরশ্বের জন্য, তারও পরের দিনের জন্য, অনন্ত ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য। আজ আমার এমন কিছুই করা উচিত নহে, যাহা আপাততঃ স্বার্থসাধক হইলেও কাল বা পরশ্ব বা দশ বৎসর পরে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

আমারই স্বার্থের হানি করিবে। লাইন ক্লিয়ার-না পাইয়া তীব্রবেগে রেলের ইঞ্জিন চালাইবার মতন মূর্খতা জগতে আর কি আছে?

যেখানে কলহের আবহাওয়া বিরাজিত, সেখানে কোনও কাজ আগাইতে চাহে না, চলিতে চলিতে থামিয়া পড়ে। এই নিয়ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র। যেখানে পরস্পরের মধ্যে একতার বোধ নাই, একে অপরের উপরে অন্যায় ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে বলিয়া যেখানে মনে মনে সন্দেহ, সেখানে কোনও কাজই দ্রুতবেগে চলিতে পারে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়-তার সৃষ্টিকারক এই অনৈক্যবোধকে সর্ব্বশক্তি দিয়া দূর করা প্রয়োজন। যাহা একটী বিরাট রাষ্ট্র সম্পর্কে সত্য, তাহা একটী সন্ন্যাসীর আশ্রম বা গৃহস্থের সংসার সম্পর্কেও সত্য। সেনাবাহিনীর নাম মারাঠা রেজিমেণ্ট, শিখ রেজিমেণ্ট, কুমায়ুন রেজিমেণ্ট, কলিঙ্গ রেজিমেণ্ট, আসাম রাইফল্‌স্ থাকিলে প্রান্তীয়তাও হয় না, সাম্প্রদায়িকতাও হয় না কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেণ্ট নামটী রাখিতে গেলে ঐ অপবাদ আসিয়া পড়ে। মানুষের মন ন্যায়-বিচার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। ভাষাসমস্যাকে এমন ভাবে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট এক ভাষাভাষীদের নেতৃত্বের অধিকার কায়েমি সত্ত্বে গিয়া দাঁড়ায়। মানুষের মন ভাবী কালের ভাবনা নিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছে, শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। বেঙ্গল রেজিমেণ্ট নামটা না-মঞ্জুর হয় ত বেশ কথা, মারাঠা, কুমায়ুন, কলিঙ্গ আদি নাম ঘুচাইয়া দিয়া সব রেজিমেণ্টকে ভারত-রেজিমেণ্ট কর। প্রান্তীয়তার জড় উৎ-খাত হইয়া যাউক। জোর করিয়া বাঙ্গালী নামটীকে অসামরিক করিয়া রাখিলে সমর-প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালীর ক্ষোভ দূর হইবে কি করিয়া? আজও ভারতের প্রধান সেনাপতি বাঙ্গালীরই ছেলে। কাল বিমান-বাহিনীর সেনাপতি বাঙ্গালীরই ছেলে ছিলেন। বেঙ্গল মোশান পিকচার

অ্যাসোসিয়েশনের নাম ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন করা হইয়াছে। বেঙ্গল অটোমবাইল অ্যাসোসিয়েশনের নাম ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমবাইল অ্যাসোসিয়েশন করা হইয়াছে। শিখ রেজিমেণ্ট, মারাঠা রেজিমেণ্ট প্রভৃতি সব প্রান্তীয় ও সাম্প্রদায়িকনামের চিহ্নধারী রেজিমেণ্টগুলি ভারত রেজিমেণ্ট নামে কেন পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না? সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করিয়া কেন অগঠিত, অনগ্রসর, অসম্পূর্ণ ভাষা-বিশেষকে উন্নততর ভাষা ও সাহিত্যের অধিকারীদিগকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা হইবে না? কারণ আর কিছুই নহে। কারণ, কর্ত্তৃত্বের অপব্যবহার।

কলহের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। একটা রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা সহজ কথা নহে কিন্তু প্রকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন রাষ্ট্র-কর্ণধার ইহা করিতে পারেন। সংসার বা আশ্রমে একাজ কঠিন নহে। প্রত্যেকে জিদ্ কর,—"কলহ আমরা করিব না, কাজই করিব।" সংসারের কাজেও তোমাদের নিজেদের স্বার্থ নাই। স্বার্থ ত তোমাদের প্রতি-জনের পুত্রকন্যাদের। আশ্রমের কাজেও তোমাদের নিজেদের স্বার্থ নাই, স্বার্থ ত কেবল জন-সাধারণের। অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদের দুঃখ নিজেরা বোঝে না, অন্ধতা বশতঃ নিজেদের পন্থা নিজেরা দেখে না, দুর্ব্বলতা বশতঃ নিজেদের বেদনা আর্ত্তচীৎকার করিয়া কাহাকেও জানাইতে পারে না,—এমন যে দুঃস্থ দুর্গত জনসাধারণ, আশ্রম ত তোমরা করিয়াছ, তাহাদের জন্য। তবে তোমরা নিজেদের মধ্যে কলহ করিবে কেন?

পরোপকার করিবার অর্থ হইতেছে পরকে নিজ শক্তির উপরে নির্ভর করিবার যোগ্যতা দেওয়া, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া নিজের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

দুঃখ নিজে দূর করিবার ক্ষমতা দেওয়া, সামর্থ্য দেওয়া। সুতরাং ভিক্ষা দিয়া তুমি পরোপকার অতি সামান্যই করিতে পার। তুমি নিজে যখন ভিক্ষা করিয়া আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ কর না, তখন অপরকে ভিক্ষার্জ্জনে উৎসাহ দান করিতে পার না। ভিক্ষার চাইতেও নিকৃষ্ট কাজ হইতেছে কম কাজ করিয়া বেশী পয়সা নেওয়া। যে এরূপ নেয়, সে নিজে মনে মনে জানে যে, সে নিয়োগকর্ত্তাকে প্রতারণা করিতেছে। দয়ার দোহাই দিয়া এরূপ প্রতারণাকে তোমরা প্রশ্রয় দিতে পার না। প্রতারকেরা প্রেমহীন লুব্ধ নেকড়েবাঘ, একবার ছাগলের রক্তের আস্বাদ পাইলে তোমার অজ্ঞাতসারে তোমারই পাছার মাংস ছিঁড়িয়া খাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

বারাণসী

২৫শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ড-সংহিতা কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-গ্রন্থ নহে, ইহার ভিতরে সর্ব্বসম্প্রদায়ের কল্যাণ আছে। কারণ, অখণ্ড-সংহিতা যাঁহার হৃৎপিণ্ড-নিঃসারিত বাঙ্ময় সার, তিনি বিশ্বের প্রতি জীবের জন্য আবাল্য কাঁদিয়াছেন, আমৃত্যু কাঁদিবেন। সর্ব্বত্র তোমরা এই গ্রন্থ পাঠ

করিয়া জনে জনে শুনাইতে পার। পরে বলিতেছি, কেন শুনাইবে। ইহা তোমাদের প্রতিজনের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, সকলের সমবেত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের দায়িত্ব হইতে একজনেও নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিও না। এই দায়িত্ব পালন করিতে করিতে পাঠ-প্রকল্পের উপরে তোমাদের সুগভীর অনুরাগ হউক। রেল-ষ্টেশনে, বিমানবন্দরে, ষ্টীমার-ঘাটে, খেওয়া-ঘাটে, খেওয়া নৌকায় বসিয়া তাস-পাশা না খেলিয়া তোমরা তাস-পাশার চেয়ে বেশী নেশা লইয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ কর এবং ভক্তি ভরে লোককে শুনাও। জগতের বহু বহু প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনান যে পুণ্যতর কর্ম্ম, এই বিশ্বাস রাখিয়া কাজ কর। একাজটী যদি তোমরা নিষ্ঠার সহিত দ্বাদশটী বৎসর চালাইয়া যাইতে পার, পৃথিবীর অনেক মরুভূমির রূপান্তর হইবে, অনেক মরুভূমিতে দূর্ব্বাঙ্কুর গজাইবে, অনেক লবণাক্ত উষর মৃত্তিকায় গুচ্ছে গুচ্ছে পরিপুষ্ট শস্য ফলিতে সুরু করিবে। অখণ্ড-সংহিতা একটী মাত্র সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-গ্রন্থ নহে, ইহা সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম-গ্রন্থ। ইহার পঠন-পাঠন প্রত্যেকের প্রয়োজন।

খুব একটা কাজ করিয়া ফেলিতেছ, এই ভাব নিয়া পাঠ-প্রকল্প চালাইও না। এই কাজে যোগ দিতে পারিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছ, অন্তরের এই কৃতকৃতার্থতা নিয়া কাজ করিবে। তোমাদের ভগবৎপ্রেমে আমি মুগ্ধ। তোমাদের জীব-জগৎ-সেবায় আমি অভিভূত। কিন্তু তোমাদের আভ্যন্তর-বিনয়ে আমি কৃতজ্ঞ হইতে চাহি। বিনয়বর্জ্জিত কর্ম্ম অজ্ঞাতসারে অপরের মনে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে, তোমাদের শ্রমের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবে।

আমি চাহি, তোমরা স্থায়ী কাজ কর। অস্থায়ী হুজুগে লাভ অতি অনিশ্চিত এবং অত্যল্প। স্থায়ী কাজ করিতে হইলেই প্রেম চাই। প্রেমহীনের অধিকাংশ কাজই অকাজের শ্রেণীভুক্ত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

বারাণসী

২২শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও—তোমরা শোনবিল নিবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীরা গত চৈত্রে বন্যার জলে চারি লক্ষ মণ ধান্য খোয়াইয়া এবং গত ভাদ্রে কালরূপী কলেরার হাতে দশ বারটী জীবন বলি দিয়া তার পরেও অটুট মনোবল নিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহিত রহিয়াছ, এই সংবাদ পাইয়া আনন্দে অভিভূত হইয়াছি। এইরূপ দুর্জ্জয় সাহসই মানুষকে মানুষ করে। ভীরুর ক্রন্দন আর পরাজিতের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস যেন কদাচ তোমাদের একজনেরও পর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিতে না পারে।

দেশব্যবচ্ছেদের পরে অধিকাংশ ছিন্নমূল পরিবার এইরূপ দুঃসাহসের অভাবে আজ পর্য্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই। মুক্ত হস্তে সহায়তা করিবার যাহাদের কথা ছিল, তাহাদের কুণ্ঠিত মুষ্টির মধ্য দিয়া যোগ্য সহায়তা যে আসে নাই, ইহা যেমন সত্য, যাহারা জন্মভূমি

হইতে বিতাড়িত হইয়া ছুটিয়া এখানে আসিয়াছে, তাহাদের নিজেদের পৌরুষবলে দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প যে সর্ব্বত্র জাগিয়া ওঠে নাই, ইহাও তেমন সত্য। জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সাহস চাই, শৌর্য্য চাই, অপরাজেয় পৌরুষ চাই। পরের সাহায্যে, অনুগ্রহদত্ত দানে বা কৃপার কণায় কখনও বাঁচিবার রাস্তা হয় না।

তোমরা তোমাদের সর্ব্বশক্তি লইয়া চেষ্টায় নামো, যাহাতে ছোট বড় প্রত্যেকের পূর্ণশক্তির বিকাশ ঘটে। সংগ্রামকে ভয় করা কাপুরুষতা। শক্তিবৃদ্ধির দিকে প্রত্যেকে লক্ষ্য দাও। চরিত্রে, শারীরিক সামর্থ্যে, ধনবলে, সঙ্ঘশক্তিতে তোমরা সর্ব্বত্র অতুলনীয় হও। প্রত্যেকের মনে প্রতিজ্ঞা জাগাও,—শক্তি আমার চাই, দুর্ব্বল আমি থাকিব না। প্রত্যেকের মনে আত্মসম্মান-বোধ জাগাও,—পরমুখাপেক্ষী রহিব না একজনেও, নিজের বাহুবলে নিজের অন্ন অর্জ্জন করিব, নিজের প্রাপ্য আদায় করিব এবং নিজের অভিরুচিতে জগতের সকলের হিতের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব দান করিব। চিন্তায় পৌরুষ, বাক্যে পৌরুষ, কর্ম্মে পৌরুষ জাগ্রত হইয়া উঠুক কিন্তু অন্তরে এই বিনয়টুকু রাখিও যে, তোমার সামর্থ্য তোমার ব্যক্তিগত ভোগলিপ্সার চরিতার্থতার জন্য নহে, বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য। তোমাকে শক্তিশালী হইতে হইবে সকল অশক্তের দুঃখ দূর করিবার জন্য,—পরপীড়নের জন্য নহে।

ঘরে ঘরে প্রেমের বার্ত্তা পৌছাইয়া দাও। একটী প্রাণীকেও অবহেলা করিও না, একজনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, একজন সম্পর্কেও উদাসীন থাকিও না। প্রত্যেকের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য সমান দায়িত্বপূর্ণ।

চারিদিক হইতে ছোট-বড় মণ্ডলীগুলি মাঝে মাঝে তোমাদের

ওখানে কাজ করিতে আসিতেছেন। সকলেই যে সমভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, তাহা নহে। কেহ কেহ কেবল আমার আদেশ পালনের রুটিন বজায় রাখিবার জন্য আসিতেছেন। কোনও কোনও মণ্ডলীর যোগ্য ভাবে আসিবার সামর্থ্যেরই অভাব। কিন্তু যখনই যে মণ্ডলী সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আয়োজন নিয়া তোমাদের অঞ্চলে কাজ করিতে আসুন, তোমরা তোমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন ও সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগ দিয়া তাঁহাদের অন্তরের শুদ্ধ অভিপ্রায়কে পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করিও। একস্থানের কর্ম্মীরা অন্য স্থানে গিয়া কাজ করিতে চাহিলে, স্থানীয় কর্ম্মি-অকর্ম্মি-নির্ব্বিশেষে সকলের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানটীকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যের দিকে আগাইয়া নেওয়া।

দৃষ্টি দাও ভবিষ্যতের দিকে। অদ্যকার ক্ষুদ্র কল্যাণ-প্রচেষ্টাটী ভাবী কালে অভাবনীয় ইতিহাসের প্রসবিত্রী হইতে পারে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় ঘটনার বীজ তুচ্ছ একটা অতীত কথার মধ্যে, ছোট্ট একটা অতীত ঘটনার মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। যাহারা ইতিহাসের গতিপথ দেখিবার দৃষ্টি রাখে না, তাহারা ছোট্ট কাজটীকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করে। ছোটর মধ্যেই বড় লুকাইয়া আছে। সব ছোটকে তোমরা সম্মান কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

বারাণসী
২৫শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কন্যার বিবাহ হইবে, ইহা ত আনন্দের কথা। ভাল ঘর, ভাল বর পাইয়াছ, বেশ কথা। বিবাহ দিয়া দাও। আমার অনুমতির প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে কেন? আমি কি প্রত্যেকখানা পত্রের সময়-মত জবাব দিতে সমর্থ?

স্বপ্নে দেখিয়াছ, আমি তোমাকে পূজা দিতে বলিয়াছি। সে কি আমার পূজা? নিজের জন্য পূজা-আহরণে কদাচ কেহ আমাকে আগ্রহী দেখিয়াছ? আমি যাঁহাকে পূজা করি, তাঁহার পূজা কর বাবা। ওঙ্কার-বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া সমবেত উপাসনা করিলেই সব হইবে। ঐ এক পূজাতেই সকল পূজার ফল হইবে। আমাকে আলাদা করিয়া পূজা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

এদেশে গুরুদেবেরা নিজপূজা প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল। ইহা কিছু অস্বাভাবিক কথা নহে। গুরুতে গভীর নিষ্ঠা আসিলে সত্যই সাধনে মন গভীর ভাবে বসিয়া যায়। আদিতে গুরুদেবেরা এই জন্যই সম্ভবতঃ প্রতি কার্য্যে গুরুপূজাকে অত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হাজার হইলেও গুরুদেব একটা রক্তমাংসের আবরণে রহিয়াছেন। রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা কোনও কোনও গুরুদেবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা নিজের পূজা প্রবর্ত্তনকে নানাবিধ স্বার্থের অনুকূল বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। একবার একজনকে শিষ্যত্বের ফাঁদে ফেলিতে পারিলে

গুরুপূজার উপলক্ষ্যে জীবন ভরিয়া যে তাহার উপরে চাবুক চালানো যাইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন এবং এই জন্যই শত শত লোকমুখে নিজমহিমা প্রচারের ব্যাপক সংগঠন সৃষ্টি করিয়া দিনের পর দিন সমৃদ্ধিবান্ হইতেছেন।

আমার সেই দুর্ব্বলতা নাই। তোমাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আমাকে যতটুকু মানিয়া চলা দরকার, তার অধিক একচুলও আমাকে স্বীকার কর, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি তোমাকে তাঁহার প্রতি ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, সাধনায়, নিষ্ঠায় ও সাগ্রহে অনুগত হইতে, যাঁহার অনুগত হইয়া আমি সকল মানুষ ও সকল দেবতার দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়াছি।

এক অদ্বিতীয় অপ্রতিম অপ্রতিহত পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও। সম্পদে, বিপদে, উল্লাসে, বিষাদে, শৌর্য্যে, দুর্ব্বলতায়, সমৃদ্ধিতে, সঙ্কটে সেই একজনের নিকটেই নতজানু হও, সেই একজনের কাছেই নত-কন্ধর হও। সেই একজনকে ভালবাসিয়াই জীবনের সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সম্পাদন কর।

আমার সন্তান আমার বীর্য্য, আমার উদ্যম, আমার সাহস এবং আমার অধ্যবসায়কে নিজ জীবনে আয়ত্ত করুক। হাজার হাজার লোক আমার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবে আর তোমরা তাহার উপকরণ যোগাইয়া মনে মনে ভাবিবে, খুব করিয়া ফেলিয়াছি, এই প্রহসন হইতে বিধাতা তোমাদের রক্ষা করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

বারাণসী
২৬শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লিখিয়াছ, অনেক নামী লোকেরাই ব্রহ্মচর্য্য নিয়া মাথা ঘামান নাই। তাঁহারা জাতিকে নিত্য নব কর্ম্মে, নিত্য নব জ্ঞানের অন্বেষণে উদ্দীপনা দিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আর আমিই কেবল প্রতি পদে তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী শুনাইতেছি কেন?

ইহার উত্তর অতি সরল। মহৎ কর্ম্মে, মহৎ অনুশীলনে, সর্ব্বশক্তি নিয়োগের অপেক্ষা রাখে এমন প্রয়াসে আত্মনিবেদন করিলে আপনা আপনি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়,—এই কারণে কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা আলাদা করিয়া কহেন নাই। আবার, নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সুতীব্র সাধনা না থাকিলে কেহ ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বতোমুখিনী উপকারিতার কথা নিজ প্রত্যয়ে ধরিতে সমর্থ হন না—এই কারণেও অনেকে ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গের ধার-কাছ দিয়া যান নাই। ব্রহ্মচর্য্যের নাম করিয়া যাঁহারা দলে লোক ভিড়াইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আন্দোলনকে হাতিয়ার করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মীয় মতবাদকে সরলবিশ্বাসী সহজপ্রত্যয়ী লোকদের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবার সুযোগ রূপে ব্যবহার করিয়া পরিণামে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই গড়িয়াছেন, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত লাঠালাঠি

মারামারি করিতে লজ্জা বোধ করে না,—এই কারণে এক শ্রেণীর মনস্বী পুরুষেরা ব্রহ্মচর্য্য কথাটা নিয়া ঘাঁটাঘাটি করিতে চাহেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যের ধ্বজা উড়াইয়া লোক-সংগ্রহ পূর্ব্বক কোথাও কোথাও কেহ কেহ অসংযম, কদাচার ও দুর্নীতির গুপ্ত আড্ডাখানা রচনা করিয়া সমাজের জঞ্জাল ও সমস্যা বাড়াইয়াছেন, এমনও কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে,—এই সকল দেখিয়া একদল চিন্তাশীল লোক ব্রহ্মচর্য্য কথাটার উপর বিরক্ত হইয়া ইহার সম্পর্কে যত কম বলা যায়, তত ভাল মনে করিয়াছেন। আবার, ডক্টর ফ্রয়েড প্রমুখ যৌন-মনস্তত্ত্ব-বিশারদদের মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার বদহজমের দরুণ অনেক লোক ব্রহ্মচর্য্যকে অস্বাভাবিক এবং অব্রহ্মচর্য্যকে জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন এবং এই কারণে প্রয়োজনবোধে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাদানকারীদিগকে গর্হণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করা ত দূরের কথা।

একজন লোক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া বারংবার স্খলিত হইতে পারে, কিন্তু পালনের চেষ্টার মধ্য দিয়া যে পৌরুষ জাগ্রত হয়, তাহা তাহার জীবনের স্থায়ী সম্পদ। অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনে কেহ হয়ত অক্ষম হইতে পারে কিন্তু আংশিক ব্রহ্মচর্য্যও তাহাকে আংশিক বলবত্তা দিয়া থাকে, যাহা সমাজের সম্পদ। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টাকে নিন্দা করা ভুল। কিন্তু এইরূপ স্থল অসংখ্যই দেখা যাইবে যে মানসিক ব্রহ্মচর্য্য পালনে অক্ষমতা থাকিলেও কায়িক ব্রহ্মচর্য্য-পালিত হইয়া যাইতেছে। এমন দৃষ্টান্তও কোথাও কোথাও দেখা যাইবে যে, মানসিক ব্রহ্মচর্য্য পালিত হইলেও কায়িক ব্রহ্মচর্য্য স্খলিত হইতেছে। যেমন, সকামা পত্নী লইয়া যদি নিষ্কামচেতা পতি সংসার করেন বা সকাম স্বামী লইয়া যদি নিষ্কাম-মনস্বিনী পত্নী সংসার বাঁধেন, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি

হয়। কিন্তু সিকি হউক, অর্দ্ধেক হউক, দশ আনা হউক আর বারো আনা হউক, আংশিক ব্রহ্মচর্য্যও আংশিক বলবিধান করে।

একদল লোক ব্রহ্মচর্য্যকে অপছন্দ করিয়াছেন এই ভাবিয়া যে, কোনও কোনও ব্রহ্মচর্য্যপালনার্থী "অসংযমে এই বুঝি আক্রান্ত হইলাম" ভাবিতে ভাবিতে জীয়ন্তে মরার মত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে এবং সকল মহৎ কর্ম্মের অযোগ্য হয়। এইরূপ ভীতিগ্রস্ততা একরূপ মানসিক ব্যাধিমাত্র, ইহাকে ব্রহ্মচর্য্য-পালন বলিলে ভুল বলা হইবে।

কে ব্রহ্মচর্য্যের কথা জীবনে একবারও উচ্চারণ করেন নাই, কে ব্রহ্মচর্য্যের নিন্দা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় নিয়া মনে মনে দুশ্চিন্তা পোষণ না করিয়া জীবনের যেই কর্ম্মস্থলে দাঁড়াইয়া যে যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইতে পার, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে তাহা করিয়া যাও। ইহার সদ্য ফল তুমি পাও আর না পাও, তোমার বংশ-বাহকেরা নিশ্চিত পাইবে। মানুষের জীবন তাহার নিজ শরীরটার মধ্যেই আবদ্ধ নহে, তাহার পুত্র-কন্যার মধ্যেও উহা বিসর্পিত।

যখনই শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে, তখনই জাতির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রদাতারা সক্রিয় হন। ইহা অনেক জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাসে দেখিতে পাইবে। নাগা প্রভৃতি অনেক পার্ব্বত্য জাতি যুদ্ধোদ্যমের পূর্ব্বে সমস্ত পুরুষদিগকে স্ত্রীদের সংশ্রব হইতে দূরে নিয়া রাখিত। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

তোমরা নামী লোকদের সত্য, অর্দ্ধসত্য, মিথ্যা বা অর্দ্ধমিথ্যা নানারূপ সাক্ষ্যদানের দিকে না তাকাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া তাহার ফলাফল নিজেদের জীবনে উপলব্ধি কর। তাহা হইলেই আর তোমাদের নিষ্ঠায় দুর্ব্বলতা আসিবে না।

আমি ত ব্রহ্মচর্য্যকে ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র বলিয়া জানিয়াছি। একদা ভারতের কাছ হইতে এই শিক্ষা সমগ্র জগৎই গ্রহণ করিবেন এবং ব্যাপক ভাবে ইহার প্রচার করিবেন। অকাতরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কেহ কেহ অব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে সত্য কিন্তু ভূজবীর্য্যলাভের সহিত সর্ব্বজনের প্রতি অকৈতব প্রেমের সমন্বয় সাধনই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান বিশেষত্ব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

বারাণসী

হরিওঁ

২৬শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দেখিতেছি, তুমিও আমার মতই ব্যস্তবাগীশ। শেষ রাত্রে উঠিয়া অদ্য এই মাত্র বনগাঁওয়ের এক ব্যস্তবাগীশকে যাহা লিখিলাম, ঠিক হুবহু তাহাই তোমাকেও লিখিতেছি,—

"শ্রমের মধ্যে বিশ্রাম, কর্ম্মের মধ্যে সমাধি, সমাধির মধ্যে কর্ম্ম এবং বিশ্রামের মধ্যে শ্রম,—ইহাই আমার যোগ। সুস্থ শরীরে কাজ কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

নাম কর আর কাজ কর। কাজ কর আর নাম কর। প্রত্যেকটী প্রাণীকে কাজে হাত দিতে হইবে। কেহ কাজ করিল, কেহ বসিয়া

রহিল, ইহা যেন না হয়। যে পারে, বেশী কাজ করুক, যে পারে না, কম কাজ করুক, কিন্তু প্রত্যেকেই কাজ করুক। বসিয়া থাকার মধ্যে কোনও বাহাদুরী নাই। যে পারে সূক্ষ্ম কাজ করুক, যে না পারে, স্থূল কাজ করুক, তবু কিছু করুক। তবে সৎ কাজই করুক, অসৎ কাজ নহে। কাজ করুক সদ্বুদ্ধি লইয়া, সরল মন লইয়া, অসদ্বুদ্ধি ও কুটিল মন লইয়া নহে।

ধর্ম্মসাধকেরা কর্ম্মকে ভয় করিবেন, ইহা যুগোচিত নহে। ধর্ম্মকে কর্ম্মের উপরে এবং কর্ম্মকে ধর্ম্মের উপরে ভিত্তিমান্ হইতে হইবে। কর্ম্ম ও ধর্ম্মের বিবাদ যখন মিটিয়া যাইবে, তখন জ্ঞান ও প্রেমের পরিপূর্ণ মিলন হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

বারাণসী

২৯শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থিতিস্থানের চারিদিকে দশ মাইলের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেকটী স্থানের প্রতিটী পরিবার ও ব্যক্তির দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং কাহাকে দিয়া কোন্ সম্ভাবনাময় কাজ হইতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লও। প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে দিয়া প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জগৎকল্যাণমূলক কিছু-না-কিছু

কাজ আদায় করিয়া লইবার মত একটী গতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি কর এবং সেই সৃষ্টিযজ্ঞে নিজেদিগকে সর্ব্বতোভাবে আহুতি দাও।

তোমরা যাহাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে বা রক্তসম্বন্ধে আত্মীয়, তাহাদের উপরে তোমাদের এই দাবী কার্য্যকর কর যে, তাহাদের সকলকেই সর্ব্বশক্তি একই উদ্দেশ্যে একই সময়ে সমান আগ্রহ নিয়া নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির নামই সংগঠন। সকলকে একত্রে কাজে লাগাইয়া দিয়া, কাজ হইতে কেহ পিছে হঠিয়া না যাইতে পারে, তেমন উদ্যম নিদারুণ ও ব্যাপক ভাবে চালাইয়া যাইবার নাম আন্দোলন। এই যুগে সংগঠন এবং আন্দোলন এই উভয়েরই প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য না হইয়া যখন ইহা বিশ্ববাসীর স্বার্থের জন্য হয়, তখনই ইহা সার্থক।

তোমাদের গ্রাম ও জেলাকে তোমরা বিশেষ সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ গ্রাম বা জেলা বলিয়া মনে করিও। বর্ত্তমান হীন দশা দেখিয়া ইহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্তরে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে যাইও না। অবিলম্বে সকলের মধ্যে একতার প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগাইয়া দাও। এই ঐক্যবোধকে মানসিক স্তরেই আবদ্ধ না রাখিয়া নিবিড় প্রেমোদ্দীপনা এবং ব্যাপক কর্ম্মোদ্দীপনা দ্বারা ইহাকে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবার সহায়তা দান কর।

ধর্ম্মের নামে বা সংস্কৃতি-প্রসারের নামে নারীর সতীত্বে আঘাত-দায়ক যে সকল কুকার্য্য নানা স্থানে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে চলিতেছে, তাহা দ্রুত বন্ধ করিয়া দিয়া উন্নত আদর্শবাদমূলক লোকহিতকর কর্ম্ম সম্পাদনের যোগ্য ক্ষেত্র সমূহ তোমরা তৈরী কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

বারাণসী
২৯শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সময় মতন উত্তর দিতে পারি নাই, কেননা, আমি বড় কার্য্যব্যস্ত।

পরিবেশ তোমাকে উন্মাদিত করিতেছে। এই ত তোমার সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান অতীব সহজ। যাহাদের দেখিলে কামোন্মাদনা জাগে, তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা কর।

বলিবে, ইহা কঠিন। না, কঠিন নহে। দুই দিন চারিদিন অভ্যাস করিলেই দেখিবে আস্তে আস্তে ইহা সহজ হইয়া যাইতেছে। বহু দুরন্ত লম্পট এভাবে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ব এর ভাব স্বভাব। সর্ব্ববস্তুতে পরমেশ্বরকে দেখিতে দেখিতে সর্ব্ববস্তুতে তুমি নিজেকে দেখিবে। তখন তোমাতে আর পরমেশ্বরে ভিন্নতা-বোধ থাকিবে না। তখন তুমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, জীবন্মুক্ত পুরুষ।

ভয়-ভাবনা ছাড়িয়া দাও। যাহা লিখিলাম, তাহা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস শক্তির উৎস। বিশ্বাস সাধনের প্রেরণাদাতা। বিশ্বাস প্রত্যক্ষের কারণ।

বিশ্বাস লইয়া প্রত্যহ একটু একটু করিয়া অভ্যাস কর। আতঙ্কে মরিয়া যাইও না, আতঙ্কের কোনও প্রয়োজন নাই। পুঞ্জীকৃত বাধার মধ্য দিয়া সহস্র জঞ্জাল অনায়াসে সরাইতে সরাইতে নিশ্চিন্তে তুমি অগ্রসর হইয়া যাও। নিজেকে অবিশ্বাস করিও না।

প্রেমময় পরমেশ্বর আমার কণ্ঠে বসিয়া তোমার প্রয়োজনে এই কথাগুলি বলাইতেছেন। কামের পঙ্ক হইতে নিজের শক্তিতে তুমি নিজেকে উদ্ধার করিবে, পরম প্রেমিক হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

বারাণসী
২৯শে পৌষ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া যুগপৎ সুখী এবং দুঃখী হইলাম। সুখী হইলাম এই জন্য যে, তোমার ভিতরে সংযমের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। দুঃখী হইলাম এই জন্যই যে, স্ত্রীকে তুমি সংযমের পথে পাইতেছ না।

গ্রাম অঞ্চলে স্ত্রীলোকেরা বিবাহের আগ হইতেই এই শিক্ষা পায় যে, স্বামীকে সম্ভোগ দিয়া বশ করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহাকে বাগে রাখা যায় না। এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হইয়া অনেক মেয়েরা পুরুষকে জ্বালাতন করে।

আমার রচিত 'সধবার সংযম' এবং 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য' বহি দুই খানা পাঠ কর এবং স্ত্রীকে পাঠ করিয়া শোনাও। কিছুকাল পরে দেখিবে, পত্নীর জীবনে যুগান্তর আসিয়াছে। শুনিতে শুনিতে তাহার ভিতরে নবচেতনা জাগিয়া উঠিবে।

সম্ভোগ করিতে করিতে নিতান্ত কামুকেরও সম্ভোগ-লালসা ক্রমশঃ

কমিয়া যায়। তখনও যে সে কুকার্য্য করে, তাহা একান্তই অভ্যাসের দাসত্ব। সঙ্কল্পের বলে এই অভ্যাসের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়। বহু গৃহস্থ তাহা করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহা তোমার পক্ষেও অসাধ্য হইবার কথা নহে।

তোমার নিজের যদি ভোগের-লালসা কমিয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীকে তুমি সহজেই লালসাহীনা করিতে পারিবে।

ভোগলালসা কমাইবার প্রথম উপায়, কিছুকাল দিবারাত্রি কেবল চিন্তা করা,—"আমি দেহ নহি, দেহী, আমি অপাপবিদ্ধ আত্মা।"

ইহার কিছু কাল পরে দিবারাত্র চিন্তা করা,—"আমার পত্নী দেহ নহে, দেহী, অপাপবিদ্ধ আত্মা।"

ইহার কিছুকাল পরে কেবল দিবারাত্র চিন্তা করা—"শরীরের সহিত শরীর মিলিত হয়, শরীরের কোনও লাভের জন্য নহে; শরীরের ইহাতে শ্রীবৃদ্ধি বা কোনও বিশেষ কল্যাণ নাই, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মার সহিত আত্মাকে মিলাইয়া লওয়া।"

ইহার কিছুদিন পরে কিছুকাল দিবারাত্র কেবল ভাবিতে হইবে,—"আত্মার সহিত আত্মার মিলনের জন্য শরীরের সহিত শরীরের মিলন একান্ত জরুরী নহে। মনের সহিত মনের মিলনের দ্বারা আত্মার সহিত আত্মার মিলন সম্ভব করা যায়। আমি তাহাই করিব।"

অতঃপর পুনরায় কিছুকাল ধরিয়া একাধারে প্রথমোক্ত ভাবনা তৎপরে দ্বিতীয়োক্ত ভাবনা তৎপরে তৃতীয়োক্ত ভাবনা ইত্যাদি করিতে থাকিবে।

দুই এক মাসের মধ্যেই দেখিবে যে, তোমার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে।

এই সকল অনুশীলন আমার বিবাহিত সন্তানদের বহুজনের জীবনের সুপরীক্ষিত প্রক্রিয়া। মন দিয়াই মনকে জয় করিতে হইবে। তাবিচ, কবচ, ঝাড়ফুঁক বা জড়িবুটি দ্বারা নহে। কোনও কোনও স্থলে যোগ্য গুরুর প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র এই সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিয়াছে। আমি তোমাকে দীক্ষা নিবার জন্য উৎসাহিত করি না। প্রথম কারণ, আমি শিষ্য-সংখ্যা-বর্দ্ধনে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয় কারণ, দীক্ষা কখনও সর্ত্ত করিয়া চুক্তি করিয়া নেওয়া উচিত নহে। চুক্তিবোধ-বর্জ্জিত সর্ত্ত-পূরণের দাবীহীন অকপট আনুগত্যের মধ্য দিয়া দীক্ষা-কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে সাধন করিতে করিতে অতি সহজে গুরুর অহৈতুকী কৃপা উপলব্ধিতে আসে।

তোমাকে পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। হয়ত আমাকে পথে অথবা ট্রেনে কোথাও দেখিয়াছ। তাহাতেই তোমার মনে সুগভীর ভক্তির উন্মেষ হইয়াছে। ইহাতে সুখী হইয়াছি। আমি চাহি যে, আমি যেখানে যাহাকে পথে ঘাটে নিমেষের জন্যেও দেখিতে পাই, সেখানে যেন তাহাকে পরমেশ্বরের প্রতীক ভাবিয়া ভক্তি করিতে পারি। স্নেহ ও ভালবাসা সব-কিছুর চেয়ে ভক্তি মহত্তর বস্তু। স্নেহ-ভালবাসার আতিশয্য কখনও কখনও পদস্খলনেরও সহায়তা করে কিন্তু ভক্তি যতই বাড়ে, ততই উন্নতির পথ খুলিয়া দেয়।

কাতর প্রাণে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের চরণে নিবেদন করিবে,—"হে পরম-মঙ্গলময় প্রভো, আমাকে জ্ঞান দাও, শক্তি দাও, ভক্তি দাও।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

বারাণসী

৩রা মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি গারো পাহাড়ে এমন এক জায়গায় গিয়া কর্ম্মসূত্রে পড়িয়াছ যে, চারিদিকে পাহাড়ী আর পাহাড়ী, খ্রীষ্টান আর খ্রীষ্টান। একটীও সমধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ বা নারীর মুখদর্শন করিতে সুযোগ পাইতেছ না।

কিন্তু খ্রীষ্টানরাও ঈশ্বরকে মানে। তাহাদের সহিত ঈশ্বরের বিষয় নিয়া আলাপ-আলোচনা কর। দুদিন পরে দেখিবে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার উপাসনাকালে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে আসিতেছে।

অবশ্য যদি দেখিতে পাও যে, দুই একজন যোগ দিতে আসিলে অন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ-সৃষ্টি হইতেছে, তাহা হইলে আপাততঃ এই অধ্যবসায়ে বিরত রহিও। কারণ, আমাদের কাজের রীতি হইতেছে line of least resistance বা স্বল্পতম সংঘর্ষের পথ।

একদা সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের একত্র মিলিয়া উপাসনা করা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইবে, এই বিশ্বাসটী রাখিও। জগতে এই অঘটনের আমিই প্রথম অগ্রদূত।

খ্রীষ্টান মেয়েরাই যদি তোমার সহিত উপাসনা করিতে আসিতে বেশী আগ্রহী হয়, তাহা হইলেও এই অধ্যবসায় হইতে বিরত হইবে। গারো মেয়েরা বড় সরলা এবং স্বভাবে একান্তই চিত্তাকর্ষিকা। ঈশ্বরের উপাসনার উপলক্ষ্য করিয়াও তাহাদের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ হইও না।

কিন্তু তোমার জীবনের নিষ্ঠা, ধর্ম্মের আদর্শ এবং সর্ব্বজনীন প্রেম সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে বারংবার মানুষের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ঘটিতেছে। কত হিন্দু মুসলমান হইল, কত মুসলমান খ্রীষ্টান হইল, কত খ্রীষ্টান বৌদ্ধ হইল, আবার কত বৌদ্ধ মুসলমান হইল, আবার কত মুসলমান হিন্দুও হইল। এই যে ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহের চক্র ধরণীবক্ষ মথিত করিয়া অবিরাম অবিশ্রাম চলিতেছে, তাহাতে যাহারা সংঘবদ্ধ, তাহারাই জয়িষ্ণু হইতেছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মমতেই এমন জিনিষ আছে, যাহা প্রত্যেক মানবের পক্ষেই একান্ত হৃদয়গ্রাহী। সেই পরমরমণীয়, পরমসুখপ্রদ, পরমাস্বাদনীয় বস্তুই তোমার প্রাণ হউক। এই জন্যই তোমার নাম রাখিয়াছি অখণ্ড।

ধর্ম্ম মানুষকে শান্তি দিয়াছে, আবার দৌরাত্ম্যও যথেষ্ট করিতেছে। সিংহের সাহসই তোমাদের প্রয়োজন, রক্তপিপাসা নহে। তুমি গারো পাহাড়ের ঐ জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়াও সিংহসাহসিকতা সহকারে কাজ করিয়া যাইতে থাক। ধর্ম্মের মানচিত্র পৃথিবীতে বহুবার বদল হইয়াছে, তোমাদের সাহস, শৌর্য্য, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকিলে আর একবার হইবে।—ইহা অসম্ভব নহে।

দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতের মুঠায় আনিবার দুর্ণিবার লোভে এবং নিজেদের বাহুবলে স্বাধীনতা অর্জ্জনের শক্তি এখনো আসে নাই, অবচেতন মনের এই হীনমন্যতার ফলে সোণার দেশকে দ্বি-ত্রি-খণ্ডিত করিয়া যাঁহারা দয়াদত্ত স্বাধীনতার মাকাল ফল আহরণ করিলেন, তোমাদের গৃহ-বিচ্যুত, সমাজ-বিতাড়িত, নিরুপায় জীবনে বাধ্যকর বনবাস গ্রহণের জন্য মুখ্যতঃ তাঁহারাই দায়ী, এই ঐতিহাসিক সত্যকে

অস্বীকার করিতে কে পারে? কিন্তু এখন আর পিছনের দিকে তাকাইবার সময় নাই। তোমরা গৃহ-বিতাড়িত হইয়াও যে নূতন পৃথিবীর সৃজন করিতে পার, সংগঠনী প্রতিভা, সৃজনী যোগ্যতা, নবোন্মেষশালিনী পটুতা যে তোমাদের আছে, প্রকৃত কর্ম্ম দিয়া, স্থায়ী কীর্ত্তি দিয়া, অভাবনীয় সৃষ্টিসম্ভার দিয়া তাহা তোমরা প্রমাণিত কর। তোমাদের এই চেষ্টা দেশ, জাতি এবং জগৎকে পরম কুশল দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

বারাণসী

৯ই মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটী ভদ্রমহিলার কথা লিখিয়াছ। তাহার ছেলে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। সব সম্বন্ধই ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

ছেলে যদি সাধু-সন্ন্যাসী হইবার মতলব না রাখে, তাহা হইলে দুইটী সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ কোথাও সে তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে, সেইখানে বিবাহ হইলে সে সুখী হইবে বলিয়া সে মনে করে। দ্বিতীয়তঃ হয়ত কোনও মেয়ে তাহার বিশ্বাসভাজিনী হইয়া পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, যাহার জন্য সে স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষী। তৃতীয় একটা কারণ হইতে পারে, যাহা এই ক্ষেত্রে আমি

দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত অনুমান করি না, কোন কোন যুবকেরা হইয়া বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে।

পুত্র বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সযত্নে এই অনিচ্ছার কারণ মঙ্গল-অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিবাহযোগ্য পুত্র পিতামাতার ইহা প্রশস্ত। অভিপ্রায় অনুযায়ী পাণিগ্রহণ করিবে, সামাজিক জীবনে নিজের বিবাহ না করিলে অনেকে পরিণামে দুর্নীতি-কবলিত হইয়া সুসঙ্গত এবং এবং সমাজের উভয়ের অনিষ্ট করে. এজন্য বিবাহ একটী সাধু-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা। কিন্তু সত্য সত্যই কাহারও নিঃসঙ্গ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণের আগ্রহ আসিয়া থাকিলে তাহাকে উপযুক্তভাবে সৎলোকেরা তৎপরে সেই পথে চলিবার উৎসাহ প্রদান করা উচিত। ভরিয়া বিবাহ না করিলে যেমন পৃথিবী অসৎ লোকের বংশাবলীতে অকাতরে যাইবে. তেমনি আবার সৎলোকেরা সাধু-সন্ন্যাসী না হইলে সমাজ সমাজসেবা করিবার যোগ্য কর্মীদের শ্রম ও ত্যাগের সুফল হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে। সুতরাং পুত্রের যোগ্যতা বুঝিয়া পিতামাতাকে কখনও দুঃখ সহিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নারীজাতির প্রতি অবিশ্বাস যাহাকে বিবাহে নিবৃত্ত করিয়াছে, তাহার সহিত যে মেয়েরই বিবাহ দাও, সেই অসুখী হইবে। কেননা, স্বামীর সন্দেহবায়ু পত্নীকে নিরন্তর অকারণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়া দিবে। নারী-বিদ্বেষীরা উত্তম সমাজ-সেবকও হন না,—প্রকৃত সমাজ-সেবকেরা নারীজাতিতে শ্রদ্ধাশীল। নারীবিদ্বেষীর অন্তরের বিদ্বেষ কমাইয়া দিবার জন্য তাহাকে কিছুকাল নিজ মনে থাকিবার সুযোগ দিতে হইবে। কাল মাতার পুত্রশোক কমাইয়া দেয়, বঞ্চিতের নারীবিদ্বেষও কমাইতে পারিবে।

রুগ্নতা হেতু যাহারা বিবাহে অনিচ্ছুক, তাহারা যে একদিন হঠাৎ বিবাহ করিয়া ফেলিবেন না, তাহা নহে। হঠাৎ বিবাহ করিবে এবং একটী নিষ্পাপা যুবতীকে কুৎসিত রোগে আক্রান্তা করিবে। অথবা ধর বিবাহ সে করিলই না কিন্তু রিপুর তাড়নায় হঠাৎ হয়ত কোথাও কোনও অলভ্য সুযোগ পাইয়া গিয়া কোনও রমণীর সর্ব্বনাশ করিবে। কেননা, রোগ ছড়াইবার দিকে রুগ্ন ব্যক্তির প্রবল আগ্রহ থাকে। ফল সমাজের এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে ঘৃণা, ভয়, কুণ্ঠা. লজ্জা সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া জোর করিয়া ইহার চূড়ান্ত পরীক্ষা করান উচিত এবং জবরদস্তি করিয়া পূর্ণ আরোগ্য পর্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা সুদীর্ঘকাল চালান উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১১ই মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কেন তুমি নূতন স্থানে গিয়া দীক্ষা নিবে? দীক্ষা কি মানুষের বারবার হয়? ইহা কি জলযোগের ছোলা যে, পছন্দ হইল না, ফেলিয়া দিলাম, কাল আবার বাদাম-ভাজা খাইব? বারবার মন্ত্র চাখিবার প্রবৃত্তি মানুষের সাধন-নিষ্ঠাকে দুর্ব্বল করে।

তুমি যখন এক স্থানে দীক্ষিত রহিয়াছ এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত সেই মন্ত্র সাধনে তোমার অশেষ রুচি রহিয়াছে, তখন কাহারও রক্তচক্ষু দেখিয়া, কাহারও অভিসম্পাতের ভয়ে বা কাহারও প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া নূতন আর এক স্থানে দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নাই।

দীক্ষাদাতাদের নির্লজ্জতারও বলিহারি দেই। দীক্ষাটা একটা রুজী-রোজগারের রাস্তা হওয়াতে এই নির্লজ্জতা গুরুদেবদের এবং তাহাদের চেলা-চামুণ্ডাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। তোমার যেখানে মন মজিয়াছে, তুমি দেহ-মন-প্রাণ দিয়া সেইখানেই লাগিয়া থাক।

সাধনে নিয়ত লগ্ন হইয়া থাকাতেই জীবনের সার্থকতা। বারংবার মত এবং পথের পরিবর্ত্তনে সাধনে নিঃশেষে নিমগ্ন হওয়ার বিঘ্ন জন্মে। একনিষ্ঠাই সাফল্যদাত্রী। অন্য কোনও দিকেই তাকাইও না। এই ব্যাপারে বন্ধুদের অনুরোধ, আত্মীয়দের উপরোধ, ক্যানভাসারদের উপদ্রব, গ্রাম্য অপদেবতাদের ভ্রূকুটী সব উপেক্ষা কর। বিবেকের বাণীই বাণী। অন্য সকলের উপদেশ চামচিকার চীৎকার মাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

বারাণসী
১৪ই মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আশ্রমে একটা জলবসন্তের হিড়িক পড়িয়াছে। একজনের পর একজন করিয়া শয্যাশ্রয় লইতেছে। তদুপরি একটী নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী

ভরত গিয়াছে মাতৃসন্দর্শনে দেশে। সুতরাং আমার শ্রম ও অনবসর বুঝিতে পার। হাজার পত্রের স্তূপ ঠেলিব, তবে ত জবাব দিব?

নিষ্ঠা জিনিষটার অভাব হইলে জীবনে সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। যে কাজ ধরিয়াছ, যে ব্রত নিয়াছ, তাহার চূড়ান্ত না দেখিয়া ফিরিবে না, এই পণ কর। এরই নাম নিষ্ঠা। প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির কদাচ পরাজয় ঘটে না। লাগিয়া থাক, কাজ ছাড়িও না, মৃত্যুপণ করিয়া নিজ কাজ চালু রাখ।

সাংসারিক কর্ম্মে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, যোগ-তপস্যায় সর্ব্বত্র নিষ্ঠার জয়। কথায় বলে, লাগিয়া থাকিলে মাগিয়া খায় না। কথাটা অতীব সত্য।

চঞ্চলতা আসে আত্মবিশ্বাসের অভাব হইতে। আত্মবিশ্বাসের অভাব আসে ঈশ্বরে বিশ্বাসের অল্পতা ও অগভীরতা হইতে। প্রাণপণে তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসকে প্রবল কর, গভীর কর, ব্যাপক কর। এই একটী মাত্র সম্পদের বলে তুমি জীবনের সব কৃতিত্ব অর্জ্জন করিবে।

ঈশ্বর-বিশ্বাস আর অদৃষ্ট-বিশ্বাস এক কথা নহে। ঈশ্বর-বিশ্বাস জ্বলন্ত আত্মপ্রত্যয় দেয়, অদৃষ্ট-বিশ্বাস নিজের হীনতা প্রকট করে, আত্মাকে দুর্ব্বল করে। আত্ম-প্রত্যয়ী হও।

অনেকে বড় কাজে করে হুজুগ, ছোট কাজকে করে তুচ্ছ। তুমি তোমার জীবন হইতে হুজুগকে দূর কর, প্রতিটি ছোট কাজ আত্মপ্রত্যয় লইয়া কর।

আমার আশীর্ব্বাদ আলাদা করিয়া চাহিতে হয় না। আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

বারাণসী

হরি ওঁ

২৩শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভরত সময় মতই দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কম্পোজের কাজ ধরিয়াছে কিন্তু অঞ্জন চলিয়া গেল কালনা, আর উষারঞ্জন এখনো বিছানায় পড়িয়া। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে শ্রীমান্ উষা সুস্থ হইবে আশা করি, তবু তাহাকে এভাবে ফেলিয়া রাখিয়া রওনা হইতে প্রাণটা চাহিতেছে না। বার বার প্রোগ্রাম-বদল হইয়াছে, অন্ত কোনও প্রকারে রওনা হইব মনে করিয়াছি।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি তোমাদের একজনকেও কদাচ ভুলি না, তোমাদের প্রতিজনের সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলি। তোমরা জীবনে উন্নত হও, মহৎ হও, জগদ্বাসীর নিঃশ্রেয়স সেবায় লাগ, ইহা নিরন্তর কামনা করি। আর, তোমরা সহস্র কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে একটীবার করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিবার অভ্যাসটুকু করিবে না?

সর্ব্ব-কর্ম্মে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত কর। সংসারের সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও নিয়ত ঈশ্বর-স্মরণ কর। তাঁহাকে ভুলিও না, তাঁহার নাম ভুলিও না। তাঁহার অপার প্রেম, অসীম করুণা, অনন্ত মহিমা ভুলিও না। তাঁহাকে নিয়ত মনে ধরিয়া রাখিতে রাখিতে তোমার ক্লেদপঙ্কময় জীবন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে, কলুষ-কালিমা-বর্জ্জিত দিব্য বিভায় তাহা উদ্ভাসিত হইবে।

তোমার সংস্পর্শে আসিয়া সমগ্র জগতের প্রতিটি প্রাণী দিব্য ভাবে ভাবিত হউক, পরমেশ্বরে অনুরক্ত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

বারাণসী

২৩শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নেতৃত্বের কোলাহল নহে, সেবকত্বের কোলাহল সৃষ্টি কর। কে কত অধিক সেবা দেশকে ও সমাজকে দিতে পার, তার জন্য উন্মাদিত হও।

জীবন ভগবানের কাজের জন্য পাইয়াছ। ভগবানের কাজে ইহার ব্যবহার করিয়া ইহাকে সার্থক কর।

একটী নিমেষ সময়ও বৃথা যাইতে দিও না। কাল করিব, পরশ্ব করিব বলিয়া কাজ ফেলিয়া রাখিও না। যাহা করিবার আজই কর। কাল জীবিত নাও থাকিতে পার। অবশ্য, আমি আশীর্ব্বাদ করি, প্রতি জনে কর্ম্মক্ষম শতায়ু লাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

৭

(৩৯)

হরিওঁ

বারাণসী
২৩শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভগবানকে ভালবাস। তাহা হইলেই সংসারের নীচ আকর্ষণ কমিয়া যাইবে।

যদি বল, ভগবানকে দেখি নাই, কি করিয়া ভালবাসিব? বেশ। আমাকে ভালবাস। আমাকে ভালবাসিলে আমার চরিত্রবল তোমাতে সংক্রামিত হইবে। ফলে সৎ সঙ্কল্পে জয়ী হইতে পারিবে।

ভালবাসা জগতের এক সুমহতী শক্তি। ইহার বলে কি কাজ না করা যায়? তবে, এই ভালবাসা অপাত্রে পড়িলে সবই মাটি হইল। অমৃতধারা বিষ্ঠার হাঁড়িতে পড়িলে অমেধ্য হয়। ভালবাসা কুস্থানে গেলে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

ডেহ্‌রি-অন্‌-সোন্‌
২৩শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্ম ভগবদাশ্রিত হইয়া করিব, ভগবানের নামে করিব, ভগবানের প্রীতি সাধনার্থ করিব, ভগবানের প্রতি আমার

অন্তরের ভক্তি যাহাতে অনিবার কেবল বাড়িতেই থাকে, তাহার উদ্দেশ্যে করিব,—এই ভাব নিয়া চলিতে থাক। ভাব প্রগাঢ় হইলেই কর্ম্মে তাহা রূপ নিবে। ভাবের নিবিড়তা ও গভীরতা ব্যতীত কর্ম্মে তাহার প্রতিফলন হয় না। এই জন্যই ভাবশুদ্ধির প্রয়োজন সকলের আগে।

অনেক সময়ে সদ্‌বাক্য সদ্‌ভাবনার উদ্রেক করে, কখনো কখনো সদ্‌ভাবনার গভীরতা সঞ্চারিত করে। এই কারণে সদ্‌বাক্য কুলীন বস্তু। তাহাকে অনাদর করিতে নাই। কিন্তু কেবল কথা কহিয়া যাওয়ারও একটা রোগ আছে। এই রোগ যাহাদিগকে ধরে, তাহারা দাঁত পড়িয়া গেলেও কথা কহিবে, মাড়ি পচিয়া গেলেও কথা কহিবে, জিহ্বা খসিয়া গেলেও কথা কহিবে। ইহাদের কথার আর বিরতি নাই, ছেদ নাই, শেষ নাই। ইহারা সাধকের শত্রু, কর্ম্মীর কর্ম্মনাশা আপদ এবং জাপকের ধ্যানভঙ্গকারী যজ্ঞনাশা রাক্ষস। ইহাদিগকে শশব্যস্তে প্রণাম করিয়া দূর হইতেই বর্জ্জন করিবে। চক্ষুলজ্জায় বা খাতিরে পড়িয়া ইহাদের বকবকানি শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

কর্ম্ম ছাড়া জীবের চলিতে পারে না এবং প্রতিটি কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যেই করিতে হইবে। এই দুইটী সত্য স্বীকার করিয়া লইবে। এই স্বীকারের মধ্যে যেন কুণ্ঠা বা দ্বিধা না থাকে।

অতীতের আচার্য্যপাদেরা অনেকে কর্ম্মবর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন। বৃথা দেন নাই। সেই যুগ সর্ব্বকর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া চলিবার উপযোগী ছিল। আর, কাম্য কর্ম্ম চিরকালই নিত্য নূতন আসক্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। আসক্তিই বন্ধন, জীবন্মুক্তিই মানুষের লক্ষ্য। বন্ধনের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সম্ভাবনাকে দূরে রাখা প্রাজ্ঞোচিত। তাই তাঁহারা অকাতরে কর্ম্মবর্জ্জনের উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন এই উপদেশের দ্বারা যুগোপযোগী ভাবে জীবহিতই সম্পাদন করিয়াছেন।

আজিকার যুগ একেবারেই আলাদা। এ যুগে স্বেচ্ছাদত্ত দান কমিয়া গিয়াছে। মঠ, আশ্রম, প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য কর্ম্মের নিন্দক মহাত্মাদিগকেও লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া খোশামুদির জাল ছড়াইয়া দানের ইলিশ-মৎস্য নৌকায় তুলিতে হইতেছে। অর্থাৎ মঠ, আশ্রম, প্রতিষ্ঠান আদি চালাইবার টাকা সংগ্রহ করার বিদ্যাও চৌষট্টি কলার ন্যায় একটী অতীব জটিল কলাবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। এ যুগে যিনি বেশী তার-স্বরে কর্ম্ম-বর্জ্জনের উপদেশ দিবেন, তাঁহাকেই তাঁর মঠ চালাইবার জন্য ধন-সংগ্রহ-কলার বেশী করিয়া কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে, অর্থসংগ্রহ-বিদ্যার অধিকাধিক অনুশীলন করিতে হইতেছে। ইহাও চমৎকারিত্বপূর্ণ একটী কর্ম্ম, যাহা একমাত্র সুনিপুণ করযুগলেই শোভা পায়। অথবা ইহা রাজাঙ্গুরীয়ক, ইহা সামান্য ব্যক্তির আঙ্গুলে পরাইলে মানায় না। সুতরাং কর্ম্মবর্জ্জনের নীতিকথা একান্তই বেঘোরে পড়িল এবং মাঠে মারা গেল।

তোমরা কর্ম্মবর্জ্জনের গুণপ্রশংসা শুনিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। প্রতিটি কর্ম্মকে ঈশ্বর-সাধনের প্রত্যক্ষ বা গৌণ সহায়ক করিয়া লও। কাজ কর ঈশ্বরের নামে, কাজ কর ঈশ্বরের জন্য, কাজ কর ঈশ্বরের শক্তিতে। পরমপ্রভুর অনুগত সেবক জানিয়া তাঁহার কর্ম্মে নিজেকে নিয়ত নিয়োজিত রাখ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় শাস্ত্র পড়িয়াছেন এবং আজগুবি মতা-

মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই বলিয়াছেন, ভারতীয়দের ভক্তিমার্গের একমাত্র লক্ষ্যই হইতেছে ভগবদ্‌ভক্তি, এই মার্গাবলম্বীরা কর্ম্মকে আলাদা করিয়া সম্মান দেন না, ঈশ্বরের প্রীতি-সাধনের জন্য বা ঈশ্বরে প্রীতি-সঞ্জননের জন্যই যতটুকু কর্ম্ম, তাহা করণীয়। তাঁহাদের মতে এই ভাবে ভারতীয় জীবন হইতে নীতিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন করিয়া "এথিক্‌স্" বা নীতি-শাস্ত্র বলিয়া একটা শাস্ত্র গজাইয়াছে, ভারতবর্ষের সেই বালাই নাই। এই সকল পণ্ডিতেরা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় জীবনে সাধন-মার্গ মাত্রেরই মূল ভিত্তি সত্য, অস্তেয় এবং ব্রহ্মচর্য্য। নৈতিক জীবনের এইগুলিই নির্ভরযোগ্য শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টারা ব্রহ্মচর্য্যহীনকে, চৌর্য্যবৃত্তিধারীকে, অসত্যাচারীকে কোনও প্রকারের ধর্ম্মসাধনারই যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। পাশ্চাত্য দেশে একজন মনীষী ব্যক্তি প্রকাশ্য রাজপথে স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিয়াও ঘরে আসিয়া দিব্যি দর্শনশাস্ত্র রচনা করিতে এবং যশস্বী হইতে পারেন। ভারতে তাহা সম্মানিত অবস্থা নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রকারকে নিজ নিজ যুগের উপযোগী ভাবে এই সকল নীচ লালসার ঊর্দ্ধে যাইবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। সকল নীতিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অনুশীলন প্রতিটি গুরুগৃহবাসী ব্যক্তির জীবনের উপরে সত্য, অস্তেয় এবং ব্রহ্মচর্য্যের এমন ভাবে ছাপ মারিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে যে, আলাদা করিয়া নীতিশাস্ত্র বা "এথিক্‌স্" রচনার ইহাদের প্রয়োজন হয় নাই। এই সরল কথাটি বুঝিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় নীতিজ্ঞানের উপরে অন্যায় কষাঘাত করিয়াছেন। তাহাতে তোমাদের বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই।

এমন কি কর্ম্মজীবনেও দুই একটা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিবার মত। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যদি সত্য এবং ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের প্রায় শেষ দিকে আসিয়া চূড়ান্তরূপে নিজের জীবনে ভিত্তিমৎ করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মতবাদকে লোকে শুধু মতবাদেরই মূল্য দিত, ইহার অধিক সম্মান তাঁহার মতবাদের যাহা হইয়াছে, তাহা কদাপি লভ্য হইত না। এই সম্মান তাঁহার সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি নীতিজ্ঞানের মূলীভূত সত্যের প্রতি।

ভারতে গুরুর উপদেশ পাওয়া মাত্র শিষ্য আজিও সত্য, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ পাইয়া থাকে।

তান্ত্রিক সাধকদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সমাজপ্রচলিত সদাচারের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধাসহকারে অসামাজিক ও অপ্রশংসনীয় কতকগুলি কার্য্য ধর্ম্মের নামে করা হইয়াছে বা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি ভারতের সহস্র জন নরনারীর মধ্যে দুই একজনেরও সমর্থন আছে কি না সন্দেহ। তান্ত্রিকদের দোহাই দিয়া ভক্তিমার্গীদিগকে নীতি-বোধ-হীন বলিয়া গর্হণ করা অযুক্তিযুক্ত কার্য্য।

সদানন্দ বেদান্তসারে জীবন্মুক্ত পুরুষ সম্পর্কে উক্তি করিয়াছেন যে, তিনি যে-কোনও কাজ করুন, তাহাতে তাহার দোষ হয় না। ইহা জীবন্মুক্ত অবস্থার বর্ণনা মাত্র, ইহা দ্বারা জীবন্মুক্ত পুরুষকে অনৈতিক, নিন্দনীয়, সমাজবিরোধী পাপকার্য্য করিতে প্ররোচনা প্রদান করা হয় নাই। যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার পাপও নাই, পুণ্যও নাই, তিনি পাপ-পুণ্য-বোধের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় জগতে অবস্থান করিতে-ছেন। এই কথার তাৎপর্য্যকে বিকৃত করিয়া সদানন্দের ঘাড়ে নীতি-বোধ-বর্জ্জিত হওয়ার দোষ চাপান সঙ্গত হয় না।

আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়াছেন। জ্ঞান যদি না হয়, তাহা হইলে কোনও সৎকর্ম্মেই জীবকে মুক্ত করিবেনা। ইহার তাৎপর্য্য এই নহে যে, "অতএব সৎকর্ম্ম করিও না, নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া চল।" বৈদান্তিক অদ্বৈতজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলেও ব্রহ্মচর্য্যই পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য সকল নৈতিক শাস্ত্রের মূল কথা। ব্রহ্মচর্য্য এই দেশের প্রত্যেকটী জীবনে কি করিয়া অনুশীলিত হইতে পারে, তাহাই ছিল প্রাচীন আচার্য্যদের চেষ্টা, ধ্যান ও অভিপ্রায়। এই জন্যই আলাদা করিয়া "এথিক্স্" নামক শাস্ত্র রচনার কোনও প্রয়োজন পড়ে নাই। পাশ্চাত্যদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের প্রথম আশ্রম বলিয়া কদাচ স্বীকার করা হয় নাই, এই জন্যই অনেকে নিজেরা দুর্নীতিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়াও "এথিক্স্" নামক শাস্ত্রের চর্চ্চায় যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞান যেখানে আলোচনারই বস্তু, উপলব্ধির বস্তু নহে, বা নিজ জীবনে প্রতিফলনের বস্তু নহে, সেখানে জ্ঞানকে একটা এব্‌স্ট্রাক্ট্ শাস্ত্ররূপে গড়িয়া তোলার পৃথক আগ্রহ অস্বাভাবিক নহে।

তোমরা পাশ্চাত্যদের অন্ধ মন্তব্যে বিভ্রান্ত হইও না।

মানুষ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে ব্যবহার করিয়া যখন কোনও সৎ বা অসৎ কার্য্যে নিজ কর্ত্তব্য অবধারণ করে, তখন তাহা নীতিশাস্ত্র বা এথিক্সের আলোচনার অঙ্গীভূত বা এখ্‌তিয়ার-ভুক্ত হয়। কিন্তু মানুষ যখন গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বা গুরূপদেশ অনুযায়ী নিজ গৃহে থাকিয়াই সদসৎকার্য্যের বিচার করিয়া লইয়া অসৎ আচরণকে জীবনই

হইতে নির্বাসিত করিয়া জীবনকে সদ্‌ভাবময় করিবার অনুশীলন চালাইতে থাকে, তখন তাহার নিজ দেশে "এথিক্‌স্" নামে দর্শন শাস্ত্রের আলাদা একটা শাখা তৈরী হয় নাই বলিয়াই কি পাশ্চাত্যদের অপেক্ষা সে হেয় হইবে? তোমরা শ্বেতাঙ্গ সমালোচকদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিজেদের সদাচার ও সৎপ্রথাগুলির প্রতি অনাদরশীল হইও না।

ঈশ্বরাশ্রিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের আলাদা কৌলীন্য থাকে না, অতএব সেই সকল কর্ম্মকে "এথিক্‌স্" নামক শাস্ত্রের অঙ্গীভূত করা যায় না, এই মিথ্যা যুক্তির পশ্চাদ্ধাবন তোমরা করিও না। পাশ্চাত্য মনীষা আমাদিগকে অনেক আলেয়া দেখাইয়াছে। এস, এবার আমরা ঘরের পানে তাকাই।

অহিংসার কথাটা আমি ইচ্ছা করিয়াই তুলিলাম না। বিগত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে এই শব্দটার এত বিচিত্র এবং অনুচিত ব্যবহার হইয়াছে যে, কিছুকাল আমাদের আলাপ-আলোচনা হইতে এই শব্দটাকে দূরেই রাখা সঙ্গত জ্ঞান করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

গয়া
২৪শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রতিজনে ইতিহাস রচনা করিতেছ, কিন্তু তাহা তোমরা জান না। বড় বড় নামী লোকের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, আলাপ,

প্রলাপ, বিলাপ, কর্ম্ম, অকর্ম্ম অপকর্ম্ম প্রভৃতির বর্ণনা যাঁহারা কাগজে কলমে কালির আঁচড় দিয়া করিতেছেন, তাঁহারা ইতিহাসের রচয়িতা নহেন, রচয়িতা তোমরা। সাধারণ লোকদের ত্যাগ ও সামর্থ্যের সহায়তায় যাঁহারা অসাধারণ হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের জীবনই দেশ, জাতি বা জগতের ইতিহাস নহে। তুমি, আমি, রামা, শ্যামা, যদু, মধু প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কি ভাবি, কি বলি, কি করি, তাহাই দেশ, জাতি বা জগতের প্রকৃত ইতিহাস। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রতি-জনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেবা সমাজকে যে দিয়া যাইতেছি, তাহাই সম্মিলিত ভাবে বিশ্বস্তর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভাবী জগতের অধিবাসী দিগকে ডাকিয়া বলিবে,—"এই দেখ, আমি এই দেশের ইতিহাস।" সংবাদপত্রের মালিকদিগকে কৌশল-বিশেষে বশ করিয়া যাহারা নিজেদের বক্তৃতাগুলি বড় বড় হরফে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিল, তাহারা নহে, তুমি, আমি, যদু, মধু, হারাণ, পরাণ আদি অতি তুচ্ছ মানুষেরা নিষ্কাম চিত্তে যদি তিলসম ক্ষুদ্র কিছু কিছু সেবা জগতের উদ্দেশ্যে জগৎপতির উদ্দেশ্যে করিয়া যাইতে থাকি, তবে আমরাই হইব ভাবী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জনক।

এস আমরা প্রতিজনে নবীন সৃষ্টির উন্মাদনায় মাতি। এস আমরা নিজেদের তুচ্ছতা ভুলিয়া যার যেটুকু আছে, বিশ্বজনের সেবার জন্য উৎসর্গ করি। এস, বিশ্বাস করি, উৎসর্গই জীবন, স্বার্থপরতাই মৃত্যু। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

ধৃতং প্রেম্না

(৪২)

গয়া

হরিওঁ

২৪শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল শোননদী পার হইলাম হিন্দুস্থান ষ্টীল কনস্ট্রাকশান কোম্পানীর তৈরী সাময়িক পারাপার-পথের উপর দিয়া। ইঞ্জিনীয়ার রাও এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে ইহা সম্ভব হইল। ভক্তিমতী ভট্টাচার্য্য-পত্নী যে আতিথ্য দিয়াছেন, তাহা তুলনারহিত।

গয়া জেলায় পড়িয়া কয়েক মাইল যাইতেই টায়ার ফাটিল। গাড়ী কিনিয়া অপরিচিত ড্রাইভার নিয়োজিত করিয়াছিলাম। সে কোন্ একদিন মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার সুযোগ পাইয়া দুইটী নূতন টায়ার কলিকাতার চোরা-বাজারে পাচার করিয়াছিল। হতভাগাকে বরখাস্ত করিবার অনেক পরে ইহা ধরা পড়ে। এখন ভক্তিমান্ সৎ ড্রাইভার পাইয়াছি, কিন্তু আগের বদল করা খারাপ টায়ার পথে পথে আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। আজ একটী নূতন টায়ার কিনিব।

গয়া এক বিখ্যাত তীর্থস্থান। ধর্ম্মের স্থান। এ জন্যই এখানে আবার অধর্ম্মও দারুণ। আসিয়াই এক বিকট ব্যাপারের বিবরণ শুনিলাম। কে নাকি এক সদ্ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ঘৃতের নিরামিষ আহারের হোটেল বহু বর্ষ হয় খুলিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার হোটেলের এক প্রকোষ্ঠে দুইটী কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা অসংখ্য পচাগলা এবং

দুই একটী তাজা মৃতদেহে বোঝাই। উপরে স্ক্রু-র প্যাঁচে বসান দিব্যি শিবমূর্ত্তি। টাকাওয়ালা খরিদ্দার আসিলে এই হোটেল হইতে আর কদাচ গৃহে ফিরিয়া যায় নাই, শিবঠাকুরের পায়ের তলায় খণ্ডিত বিখণ্ডিত অবস্থায় পূর্ব্বগামী মৃতদের দেহালিঙ্গন করিয়াছে।

কেমন, চমৎকার কাহিনী নয়? কাশীতেও এরূপ আছে। এখনো সেখানে এমন কূয়া আছে, যেখানে কাঁটা ফেলিলে মানুষের অস্থিকঙ্কাল উপরে উঠিয়া আসিবে।

ধর্ম্মস্থানে এমন সৎকার্য্য হইবে, তবে না এগুলি তীর্থ-সমূহের রাজা বলিয়া পূজা পাইবে!

গুরুদেবদের সম্পর্কেও তাহাই। অদ্য এখনি দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিব। শুনিলাম, একজন মহিলা তাঁহার গুরুদেবের আচার-ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ চিরতরে তুলিয়া দিতে চান। আমি বলিয়াছি,—হাঁ, কদাচারী গুরুকে নিমেষে ত্যাগ করা যায়। কোনো ভয় নাই, আমি ইহাকে আশ্রয় দিব।

আমি আশ্রয় দিব কি আমার নিজের কোনও শক্তিতে? যাঁর শক্তিতে আমি গুরু, একমাত্র তাঁরই শক্তিতে। এজন্যই দুরাচারী গুরুদেবেরা আমাকে ভয় পাইয়া থাকেন। এই জন্যই আমাকে বারংবার বিষপ্রয়োগে হত্যারও ষড়যন্ত্র তাঁহারা করিয়াছেন। ঈশ্বর রক্ষা-কর্ত্তা, তিনি রাখিলে কে মারিবে?

কদাচার, অনাচার, অপচার, ব্যভিচার, সমাজের কল্যাণ-বোধের বিরোধী, নারীর সতীত্ব-বোধের অপলাপকারক সকল মত ও পথ এই

দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউক। প্রত্যেকটী মানুষের মনে নীতি-বোধ আমাদের জাগাইতে হইবে। গুরু ভগবান্, অতএব তিনি দেহকে ভোগ করিলে সতীর সতীত্ব যায় না, এই জাতীয় মিথ্যা ধারণাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। গুরু যদি ভগবান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভগবান রূপে পূজিত হইবার যোগ্য সদ্‌গুণাবলি তাঁহার মধ্যে থাকা চাই। যিনি কাম-কাঞ্চনে আসক্ত হইবেন, যিনি নিজের স্বার্থসাধনের জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে লজ্জাবোধ করিবেন না, যিনি নিজের মান-সম্মান বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কিসের তিনি ভগবান? ভগবানের প্রাপ্য পূজা কেন তিনি সুকৌশলে অপহরণ করিবেন? তাঁহাকে তাহার অত্যুন্নত গুরুর আসন হইতে কাণে ধরিয়া নামাইয়া না আনিতে পার, বেশ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে দেখ। ইহাতে পাপ নাই।

দীক্ষাদান-কার্য্য সারিয়া এখনি রাজগীর যাইব, সন্ধ্যায় পৌছিব পাটনা। কাল পুপুন্‌কী আশ্রম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

পাটনা

২৫শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বশক্তি লইয়া তোমরা আত্মার উদ্ধারে আর জগদুদ্ধারে লাগিয়া

যাও। জগদুদ্ধার তার কাজ নহে, আত্মার উদ্ধার যে করে নাই। আত্মার উদ্ধার তাহার লভ্য নহে, জগদুদ্ধার যাহার ব্রত নহে। আত্মার উদ্ধার আর জগদুদ্ধার এই দুইটী জিনিষ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কান্বিত। ইহাকে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধও বলিতে পার।

বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আত্মার উদ্ধার আমাদের সাধ্য, জগদুদ্ধার আমাদের ব্রত। সমগ্র ধরিত্রীকে পাপমুক্ত শুদ্ধমূর্ত্তি করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিজস্ব শুদ্ধতা নিজস্ব অপাপ-বিদ্ধতা সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আত্মোদ্ধারে জগদুদ্ধার, জগদুদ্ধারে আত্মোদ্ধার। একটীর সহায়তায় অন্যটীর সাধন করিব, একটীর আনুকূল্যে অপরটীতে সিদ্ধি অর্জ্জন করিব। বিশ্বাস রাখিতে হইবে, ইহা আমাদের অলস কল্পনা বা বৃথা জল্পনা নহে। ইহাকে আমরা নিজেদের জীবনোৎসর্গ দিয়া সত্যে পরিণত করিব। সহস্র টন জল্পনা অপেক্ষা এক রতি সংসিদ্ধির মূল্য কোটিগুণ বেশী।

ভগবানে তোমার বিশ্বাস নাই? নাই বা থাকিল! নিজেকে তুমি বিশ্বাস কর। ভগবানকে যে বিশ্বাস করিতে পারে না, নিজেকে তাহার বিশ্বাস করিতে হইবে। এই বিশ্বাসের শক্তিতে সে জগতের নূতন ইতিহাস লিখিবে। ভগবানে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার কাজ সহজতর। ভগবদ্বিশ্বাস তাহাকে আত্মবিশ্বাস দেয়, সেই আত্মবিশ্বাস কদাচ ম্লান হয় না, ম্রিয়মান হয় না, দুর্ব্বল হয় না। ভগবানে যার বিশ্বাস নাই, তাহাকে নিজ আত্মবিশ্বাস অটুট রাখিবার জন্য আবার আলাদা করিয়া সঙ্কল্পের সাধন করিতে হয়। হউক, তবু তাহাদের আমি নিষ্প্রয়োজনীয় আবর্জ্জনা মনে করি না। ভগবানে তোমার বিশ্বাস নাই ত নাই। আমি তোমাকেও বিশ্বজনের কুশলকর্ম্মে লাগাইব।

একার জন্য বাঁচিয়া থাকা মরিয়া থাকার সামিল। ভগবানকে মানো আর না মানো, সকলের জন্য তুমি বাঁচিবার চেষ্টা কর। একার সুখের জন্য নহে, বিশ্বজনের সকলের সুখের জন্য তুমি জীবন-ধারণ কর। তোমার তেজ, বল, পৌরুষ, অধ্যবসায় সব-কিছু এই একটী উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হউক, এই একটী উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত থাকুক। একার জন্য বাঁচিয়া অন্তরে কোথায় সুখ? একার জন্য বাঁচিয়া চিত্তে কোথায় তৃপ্তি? সবার জন্য বাঁচিব, সবার জন্য বাড়িব, সবার জন্য তিলে তিলে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইব, সবার জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিব, সবার জন্য প্রাণবায়ুর যাতায়াত চিরতরে রুদ্ধ করিব। যোগ-যাগ-তপস্যা, ধ্যান-জপ-সাধনা, স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন, স্বাধ্যায়-কীর্ত্তন-প্রচারণা সব-কিছু এই একটী উদ্দেশ্য-মূলেই চলিবে। তবেই জীবনধারণ সার্থক।

বাঁচিয়া থাকা একটা দায় নহে, ইহা একটা শিল্প। শিল্পীর কুশলতা লইয়া বাঁচিতে হইবে। আমার বাঁচিবার ভঙ্গীতে যেন কবির কবিত্ব, ভাস্করের ভাস্কর্য্য, চিত্রকরের মোহন তুলিকার বর্ণাঢ্য স্পর্শ থাকিয়া যায়। বাঁচিব বিচিত্র ভাবে, যেন আমার গতিপথের চরণ-চিহ্নে সুষমাঞ্চিত পুরাণ-কাহিনী ফুটিয়া ওঠে।

জীবনের তোমরা অধমর্ণের দল পুষ্ট করিও না। জীবনের তোমরা শিল্পী হও। প্রতিপদবিক্ষেপে যাদুকরের মোহনদণ্ডের স্পর্শ রাখিয়া যাউক তোমাদের পদাঙ্গুলির চিহ্নগুলি। মানুষেরা দেখিয়া অবাক্ হউক, পূর্ব্বাগ্রজেরা কেমন করিয়া হাঁটিত, কেমন করিয়া দাঁড়াইত, কেমন করিয়া বসিত, কেমন করিয়া করিত শয়ন। তোমাদের অষ্টপ্রহরের জীবন-কীর্ত্তি যেন শিলালিপিতে ক্ষোদিত হইয়া সকলের পরম বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়া কৌতূহলের সামগ্রী হইয়া অনন্তকাল বিদ্যমান রহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

পাটনা

২৫শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এ যুগের বাণী গতি, শ্লথতা নহে। মোটর পাইলে কেহ গরুর গাড়ীতে চাপিবে না, বিমান পাইলে কেহ ট্রেণে উঠিয়া বসিবে না.— ইহাই এই যুগের রীতি। বিমানের গতিতেও নহে, স্পুটনিকের গতিতে এখন চলিবার চেষ্টা।

সেই যুগে তোমরা সাধন-ভজনেও গতিশীল হও। এক মিনিটে এক যুগের কাজ করিতে হইবে, এই জিদ লইয়া ভগবৎ-সাধনে লাগ। সাধক কবি মনোমোহন দত্ত গাহিয়াছিলেন,—এক ডাকে ফুরায়ে দে মা জন্মভরা ডাকাডাকি। তোমরাও একটী নিমেষে এক শতাব্দীর সিদ্ধি করায়ত্ত কর।

উৎসাহ এবং অধ্যবসায়, স্থিরলক্ষ্য এবং দ্রুতধাবন, ইহা তোমাদের বিশেষত্ব হউক। অষ্টপ্রহরের সাধন-নির্য্যাস তোমরা একটী শুভক্ষণের মধ্যে আয়ত্তীকৃত কর। চেষ্টা করিতে করিতে সে সুকৌশল তোমাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া যাইবে। প্রয়োজন শুধু এইটুকু যে, নিমেষ-মাত্র সময়ও তোমরা বৃথা নষ্ট হইতে দিবে না। প্রতিটী মুহূর্ত্তে শ্বাসের জমিতে ভগবানের নামের বীজ বুনিয়া যাইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

হরি ওঁ

২৬শে মাঘ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল রাত্রি সাড়ে দশটায় পুপুন্‌কী পৌঁছিয়াছি। অদ্য বরুণ দেবতাকে বাঁধিবার জন্য আর একটী নূতন শৃঙ্খল রচনায় মন দিলাম। কাজ সামান্য হইয়াছে, মাত্র দুই বস্তা সিমেন্ট খরচ হইল। চিহ্নটুকু দিয়া রাখিলাম।

মঙ্গলকুটীর হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে আর একটী প্রস্তর-কঙ্করময় রুক্ষ মরুভূমি। কাজ শেষ করিব দশ বৎসরে। আজ শুধু প্রারম্ভটুকু হইল। সৎকাজের প্রারম্ভটাই বড় কথা। আজ করি, কাল করি করিয়া কত কাজ আমরা কত জনে সারা জীবনে আর ধরিতেই পারি না। ভবিষ্যতের হাতে না রাখিয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানেই সব কাজ সুরু করা ভাল।

পরিকল্পনা যদি এমন হয়, যাহার ভিতরে আরব্ধ ও অনারব্ধ সবগুলি প্রকল্পের যথাযোগ্য স্থান সুনির্দ্ধারিত হইয়াই রহিয়াছে, তাহা হইলে একটা লোক এক সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া দশটা, বিশটা, পঞ্চাশটা কাজও ধরিতে পারে। আর, পরিকল্পনা যদি ত্রুটিহীন না হয়, তাহা হইলে একটীর অধিক দুইটী কাজে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে অনেক সময়ে কাজ বান্‌চাল হইয়া যায়।

আমার কর্ম্ম ভাবের আশ্রয়ে চলিতেছে। সমাজের সর্ব্বস্তরে

উচ্চানুভূতির রসাস্বাদনকে সুপ্রাপ্য করিতে হইবে। ইহারই নাম শিক্ষার প্রসার। জগতের প্রত্যেকটা সমাজে পরার্থে আত্মত্যাগের প্রেরণাকে জাগাইয়া দিতে হইবে। ইহারই নাম সভ্যতার প্রসার। শিক্ষা ও সভ্যতা মনুষ্যসমাজের ভিত্তি বা প্রাণ। যে সমাজ শিক্ষা এবং সভ্যতা সম্পর্কে যত গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, সে সমাজ তত উন্নত। সহস্র প্রকারের কর্ত্তব্যের দায়িত্বকে একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া কাজ করিতে পারিলে ব্যক্তি বা সমাজের অভ্যুদয় ঘটে দ্রুততর।

এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া তোমার কর্ম্মকে ধ্যানের আবেশে মণ্ডিত করিয়া লও, তোমার ধ্যানকে প্রত্যক্ষ কর্ম্মের সাহচর্য্য দাও। ধ্যান ও কর্ম্ম, কর্ম্ম ও ধ্যান একটীর আর একটী অনুপূরক হউক। কর্ম্ম করিবে ত যোগীর কর্ম্ম কর, অযোগীর কর্ম্ম নহে। যোগ করিবে ত কর্ম্মীর যোগ কর, অকর্ম্মীর বা অপকর্ম্মীর যোগ নহে।

পরমেশ্বরে নিত্যযোগযুক্ত থাকিয়া জগতের প্রতিটি পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির অনুযায়ী অপরিবর্ত্তনীয় নিষ্ঠায় কাজ করিয়া যাও। কর্ম্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া জীবন্মুক্তির সোপান হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

দুর্গাপুর

১লা ফাল্গুন ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংখ্যাবল বল নহে, সংঘবল চাই। অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় বেশী,

ইহার উপরে ভরসা করিবার কিছুই নাই। তোমরা সকলে একমত হইয়া একসঙ্গে একই সময়ে একই কাজে যাহাতে হাত দিতে পার, ইহার অনুশীলন চাই, ইহার প্রমাণ চাই, ইহার নিশ্চয়তা চাই। সংখ্যা-বল বল নহে, সংঘবলই বল। দুষ্ট লোকেরাও সংঘবলে কত কুকার্য্য-সাধন করিতেছে, তোমরা মহৎকর্ম্মে সংঘবলের অনুশীলন করিয়া বিফলকাম হইবে? এই মানসিক দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর।

অপরেরা তোমাকে ছোট জাত বলিয়া ঘৃণা করে, তোমার মনে কষ্ট হয়। তোমার চেয়ে যাহারা ছোট, তুমি আবার তাহাদিগের প্রতি বিরূপ ও অশুদ্ধ মনোভাব পোষণ কর কি করিয়া? সংঘবল-বৃদ্ধির ব্যাপারে ইহা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। ছোট-বড়'র ভেদবুদ্ধি কতক হইলেও যদি কমাইতে না পার, তাহা হইলে সংঘবোধ, সংঘশক্তি, সংঘপ্রেরণা জাগিবে কি করিয়া? বড়রা চিরকাল বড়ই থাকিবে, ছোটরা চিরকাল ছোটই থাকিবে, এই দাবীর বা জিদের উপরে সংঘশক্তি গড়িয়া বা বাড়িয়া ওঠে না।

বড়রা আরও বড়দের বিদ্বেষ করে। ছোটরা আরও ছোটদের ঘৃণা করে। ছোট আর বড়র মধ্যে এই যে বিচ্ছেদ, তাহা দূর না করিলে সংঘবল সৃষ্টিও হয় না, পুষ্টও হয় না। একদল ছোট অপর দল ছোটকে নিজেদের চেয়ে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে, একদল বড় অপর দল বড়কে নিজেদের চেয়ে কম গণ্যমান্য মনে করে। এই রূপ মনোভাব সংঘবল-সৃষ্টির পরিপন্থী।

নিজেকে এবং অপর প্রত্যেককে পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলে মনের এই দুষ্টক্ষতগুলি নিরাময় হয়।

সুতরাং অবিরাম নাম কর। নামেই প্রেম, নামেই আনন্দ, নামেই অভ্যুদয়। নামের সেবার মধ্য দিয়া অন্তরকে বিদ্বেষ-বিষ, ঈর্ষ্যা-বিষ, অনৈক্য-বিষ, অনুদারতা-বিষ এবং অদূরদর্শিতা-বিষ হইতে মুক্ত কর।

নামের আলোকে জীবনের পথ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া লও। অন্ধকার পথে নয়, আলোকময় পথে পদসঞ্চার কর। নিজের চোখে এবং খোলা চোখে পথ দেখিয়া লও এবং সজ্ঞানে আগ্রহসহকারে পথের আবর্জ্জনা সম্মার্জ্জনী-প্রহারে বিদূরিত কর।

যৌবনে তোমরা আমার নিকট যে সকল উপদেশ ও প্রেরণা পাইয়াছ, তোমাদের প্রৌঢ়ে তোমাদের পুত্রকন্যাদিগকে সেই সকল উপদেশ ও প্রেরণা দিও। আদর্শ যেন ধারাবাহিকতা না হারায়। লক্ষ্য করিতেছি যে, এই একটা অতীব আবশ্যকীয় বিষয়ে তোমরা প্রায় উদাসীন। পুত্রকন্যাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে বলিয়া কি সেই বিষয়েও তাহাদের প্রতি অবহেলা করিতে হইবে, যাহা তাহাদের সহিত, তাহাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের সহিত, তোমার সহিত এবং তোমার পিতৃপিতামহের সহিত ধারাবাহিকতার সংযোগ-সেতু রক্ষা করিবে? এমন অবহেলা মার্জ্জনীয় নহে।

আমি একটা মাত্র আদর্শের দিকেই তোমাদের তরুণ কৈশোর হইতে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিয়া আসিতেছি। তোমাদের কাহারও কাহারও পিতৃ-পিতৃব্যেরাও আমার কণ্ঠে ঐ একই ভৈরব-গর্জ্জন শুনিয়াছেন। আট বৎসর বয়স হইতে আমি বক্তা, প্রচারক, কর্ম্মী এবং আচার্য্য। আমার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে বিশ্রামের জন্য একটা

দিনের ফাঁক কদাচ রাখি নাই। মাল-গাড়ীতে প্যাক করা পূজার বাজারের মালের মত আমার প্রতিটি দিনকে আমি কাজের চাপে প্যাক করিয়া লইয়া চলিয়াছি। কিন্তু সেই কাজ বিচিত্র নহে, সেই কাজ একটী মাত্র কাজ, অনন্য সেই কর্ম্ম, তাহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, ছিল না, থাকিবে না।

এখনি শিবপুর যাইতেছি, সেখানে গিয়া পত্রের বাকী অংশ লিখিব।

বর্দ্ধমান-শিবপুর
১লা ফাল্গুন, ১৩৭১

যে আদর্শটীর কথা লিখিতেছিলাম, তাহা হইতেছে প্রাচীনের শাশ্বত সত্যকে নবীনের জীবনে সুস্থির স্থানদান, প্রাচীনের পরম রমণীয়তার সুনিশ্চিত সমাবেশ। যুগের দাবী কর্ম্মে গতির সঞ্চার চাহিতেছে কিন্তু কর্ম্ম কি ধ্যান-সমাহিত স্নিগ্ধ প্রশান্তির অবসান করিয়া চলিবে? অতীতের সৌম্য শান্ত আনন্দময় গাম্ভীর্য্যকে কণামাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া কি আধুনিক গতিচঞ্চলতার দাবীকে পূরণ করা যায় না? কর্ম্মের মধ্য দিয়া কি সমাধি সম্ভব নহে? সমাধির মধ্য দিয়া কি কঠোর-কর্ম্ম-পরিচালন আকাশকুসুম? আমি বর্ত্তমানকে কদাচ অস্বীকার করি নাই, করিব না। কিন্তু অতীতের অতুলন ঐশ্বর্য্য হইতে ইহাকে বঞ্চিত হইতেও দিব না।

ইহাই আমার নিত্যকালের ধ্যান। বৃহত্তর ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণ আমার লক্ষ্য,—অতীতের বুদ্ধিহীন অনুসরণ নহে, বর্ত্তমানের হীনবল পঙ্গু চপলতার অনুকরণও নহে। ঐতিহাসিক ভাগ্য তোমাদের যে দিক দিয়াই যতটা বিড়ম্বিত হইয়া থাকুক না কেন, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে

রিক্ততা হলাঞ্ছিত হইতে আমি দিব না। শক, হূন, দল, পাঠান-মোগল আর তারপরে ইংরাজ ও চীন তোমাদের নিয়া যেই পুতুল-খেলাই খেলিয়া থাকুক, অতীতের ভারতবর্ষকে মরিয়া যাইতে দিব না। তাহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব আমার জ্ঞানে, আমার ধ্যানে, আমার আত্মবিসর্জ্জনে। তাহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব তোমাদের কর্ম্মে, তোমাদের ধর্ম্মে, তোমাদের পুরুষকারে। তাহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব তোমাদের পুত্র-পৌত্রদের জীবনে, আচরণে, অনুশীলনে এবং সার্থক সুধন্য মরণ-বরণে। তাহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব, পৌরুষ-প্রদীপ্ত বীর্য্য-বলীয়ান্ সৎসঙ্কল্পদৃঢ়িষ্ঠ কর্ম্মকুশল এক তত্ত্বজ্ঞ জাতির নব অভ্যুদয়ে।

আট বৎসর বয়সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যদি এই দেহ একশত আট বৎসরও বাঁচিয়া যায়, এবং ইতিমধ্যে দেশের উপরে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মূঢ়তার ফলে অবর্ণনীয় বিপর্য্যয়ও আসিয়া যায়, তথাপি এই স্বপ্নটীকে জাগ্রতের সত্য জানিয়া শেষ নিঃশ্বাসটী ত্যাগ করিব। আমার এই মনোভঙ্গীকে তোমরা তরল দৃষ্টিতে দেখিও না।

কত যে কাজ তোমাদের করিবার আছে, কদাপি ভুলিও না।

কেবলই কথা কহিয়া কহিয়া তোমরা কাজের সময়, সুযোগ এবং সৌভাগ্য হারাইও না।

মিলিত হইতেছ কাজের জন্য অথচ কথা কহিয়া সময় কাবার করিয়া দিতেছ। এই কদভ্যাস তোমাদের অচিরে বর্জ্জন করিতে হইবে।

কাজ করিতেছ যতটুকু, কথা কহিতেছ তার দশগুণ, আড়ম্বর করিতেছ তাহার বিশগুণ, ভান করিতেছ তাহার শতগুণ। ফলে অসাফল্য অর্জ্জন করিতেছ তাহার সহস্রগুণ। সৈনিকেরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি চালায়, তখন বক্তৃতা দেয় কয় ঘণ্টা, প্রবন্ধ পড়ে কয় পৃষ্ঠা, কবিতা শুনায় কয় কুড়ি, দর্শনালোচনা করে কয় প্রকার? কেবল কথা আর কথা,—ইহাই যাহাদের মজ্জাগত স্বভাব, তাহারা কাজ করিবে কখন?

কাজের নাম করিয়া সবাই মিলিত হও, ঝুড়ি ঝুড়ি কথা সকলের ভারাক্রান্ত কর্ণে ঢালিয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া গা-ঢাকা দাও,—ইহা যেন তোমাদের আচরণ না হয়।

কথা দিয়া কাহারও মূল্য-নির্দ্ধারণ হইবে না, দাম ত জগতে শুধু কাজের। যে কথা কাজের পক্ষে অপরিহার্য্য, যে কথা কাজকে বলিষ্ঠ ও একাগ্র করে, কাজকে একলক্ষ্য ও বিরামহীন করে, সেই কথাই দামী, অন্য কথা নহে।

কথা কমাও।

মাঝে মাঝে মৌনাভ্যাস কথা কমাইতে সাহায্য করে। কিন্তু তুমি বা আমি যে একজন মৌনী বাবা, এই প্রশংসায় লুব্ধ হইয়া মৌনব্রত নেওয়াও এক প্রকারের ভণ্ডামি। ইহাতে লোককেও প্রবঞ্চনা করা হয়। নিজেকেও প্রতারণা করা হয়। এমন মৌন কথা কমাইবার সহায়তা করে না। এমন মৌন বরং অন্তরকে দর্পে, দম্ভে, নিজকীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের গর্ব্বে বিষাক্ত করে। বিষাক্ত মন সৎকর্ম্মের সব চেয়ে বড় শত্রু।

তোমরা সৎকর্ম্মের প্রকৃত বান্ধব হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

বর্দ্ধমান-শিবপুর
১লা ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রাচীনের অবিনশ্বর সত্য ব্রহ্মচর্য্যের স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। আত্মকল্যাণে, জীবকল্যাণে, দেশকল্যাণে, ভুবন-কল্যাণে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতাকে উপলব্ধি করিতে পারা মাত্র তোমার নয়নে অতীত ভারতের প্রতিটী মহৎ অবদানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এই একটী সত্যকে যোগ্য সমাদর দিতে না পারায় ঊনবিংশ শতকের অনেকগুলি প্রতিভাবান্ প্রগতি-পুরুষের প্রকৃষ্ট প্রয়াস প্রায় ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক হইয়াছে। এই একটী সত্যকে যোগ্য মূল্য দিতে পারিলে অল্পতর প্রতিভাধর পুরুষেরাও স্বল্প শ্রমে মহৎ ফল করামলকবৎ হস্তগত করিবেন।

তোমরা ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাস করিও।

সাহিত্যিকেরা রোমান্স লিখিবেন, লিখুন। জনচিত্তবিনোদনের জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। ছায়াচিত্র-নির্ম্মাতারা বিচিত্র প্রেমরস বিতরণ করিবেন, করুন। জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের অধিকার আছে। কিন্তু জাতিনির্ম্মাতারা এই সকল সত্ত্বেও নিজেদের সত্যে সুস্থির থাকিবেন, ইহাতে সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। সাহিত্যিক বলিয়া যিনি শ্রেষ্ঠ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন তিনিই দেশের বা জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ নাও হইতে পারেন। চিত্রাভিনয় করিয়া বা করাইয়া যিনি ভারত-

শিরোমণি উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিও দেশের বা জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ না হইতে পারেন। কিন্তু বীর্য্যবান্, বলবান, প্রেমশীল, সহিষ্ণু, ও সংযমী মহাজাতি সৃষ্টির জন্য যিনি নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন, এবং অপরকে পালন করিতে প্রতিনিয়ত প্রবুদ্ধ করিতেছেন, তিনি কদাচ নিকৃষ্ট মানুষ নহেন।

প্রচলিত লোকমতের দিকে না তাকাইয়া, যে ক্ষমতা অর্জ্জন করিলে নূতন লোকমত সৃষ্টি করা যায় এবং মহনীয় আদর্শের প্রেরণায় জাতিকে মহত্তর ভাগ্য ও বৃহত্তর ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করা যাইবে, সেই ক্ষমতার্জ্জনের দিকে সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।

বিষবৃক্ষ মহামহীরুহের বিরাট আকার ধারণ করিলে তাহার মূলোৎপাটন সহজ কথা নহে। তাহার জন্য উপযুক্ত বেগসম্পন্ন ঝড় চাই, ঝঞ্ঝা চাই, ঘূর্ণাবর্ত্ত চাই, তুর্ণড চাই। তাহাই সৃষ্টি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই ঝড়ে, এই ঝঞ্ঝায় কাহার কোন্ পরম সাধের তাসের ঘর উড়িয়া গেল, তাহা দেখিবার তোমার প্রয়োজন নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

কলিকাতা

১লা ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্কুলে চাকুরীর মেয়াদ আরও ছয় বৎসর আছে অথচ একান্তই একাকিনী বাস করিতে হইতেছে বলিয়া চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া

আসিবার কথা বারংবার তোমার মনে হইতেছে। এই বিষয়ে আমি আমার সুচিন্তিত মতামত নিম্নে লিখিতেছি।

তুমি যেখানে চাকুরী কর, সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণ আমার ভাব ও সাধনার সুফলে পরিপূর্ণ। যেদিকে তাকাইবে, কেহ-না-কেহ নামকীর্ত্তন করিতেছে, সমবেত উপাসনার আয়োজন করিতেছে অথবা ঘরে ঘরে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া লোককে শুনাইবার জন্য আগ্রহী হইয়া রহিয়াছে। বৎসরের দুই পুণ্য মাস বৈশাখ ও পৌষ প্রতি নিশীথের শেষ যামে হরি-ওঁ কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে অরণ্য-পর্ব্বত আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে। এমন স্থানকে স্বর্গ বলিতে হইবে। চাকুরীর মেয়াদ থাকিতে স্বেচ্ছায় এমন স্থান ছাড়িয়া যাওয়া কাজের কথা নহে।

আর একটী কথা কর্ম্মঠতার ও আলস্যের ফলাফলের দিক হইতে ভাবিবার আছে। কাজ করিতে করিতে ক্ষয়িত হইয়া যাওয়া, কাজ না করিতে করিতে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় দীর্ঘজীবী হইয়া থাকার চাইতে শতগুণ শ্রেয়ঃ। কাজ যাহাদের নাই, তাহাদেরও অলস থাকিলে দোষের কথা হয়। আর, তোমার হাতে কাজ আছে, তবু ছাড়িয়া দিয়া স্বেচ্ছায় অলস হইবে?

তবে, চাকুরী করিতে গিয়া যদি আত্মসম্মান হারাইয়া চলিতে হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আমি যতটা জানি, তুমি তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য সমাদৃত এবং তোমার স্বাভিলাষানুযায়ী কাজ করিয়া যাইবার স্বাধীনতার উপরে আজ তক্ কেহ সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করে নাই।

আর্থিক ব্যাপারও একটা আছে। যাহার কন্যা আছে, কন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তা আছে, তাহার পক্ষে সুনির্দ্দিষ্ট আয়ের সৎ জীবিকা পরিত্যাগ করার কোনও অর্থ হয় না।

শরীর যতক্ষণ কর্ম্মক্ষম আছে, ততক্ষণ চাকুরী ছাড়িয়া দিবার বুদ্ধি হইতে বিরত থাক। স্বামিহীনা নারীর পক্ষে নিজ বার্দ্ধক্যকালীন ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া রাখিবার জন্যও অর্থোপার্জ্জনের পন্থা অনুসরণ প্রয়োজন। ভাগ্যক্রমে তোমার পিতামাতা তোমাকে কৈশোরে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাহারই দৌলতে আজ তুমি স্বামিহীনা হইয়াও কন্যার বিদ্যার্জ্জনের সকল ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিতেছ, তাহাকে ভাল ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া লেখাপড়া করিবার সুযোগ দিতে পারিতেছ। এই অবস্থায়, এমন কোনও প্রয়োজন যদি তোমার না ঘটিয়া থাকে, যাহাতে কন্যার নিকটে সর্ব্বদা অবস্থান তোমার সঙ্গত, তাহা হইলে হুট্ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর চাকুরীটা তুমি ছাড়িয়া দিও না মা। অর্থ কেবলই অনর্থ নহে, অর্থ নানা শুভকার্য্যে প্রয়োজনীয় বস্তুও বটে।

কর্ম্ম করিয়াও সাধন-ভজন চালাইয়া যাওয়া যায়, এই যে একটী সদ্দৃষ্টান্ত তোমাদের কাহারও কাহারও জীবনে রূপবন্ত হইয়া উঠিতেছে, ইহা একটা মস্ত বড় গৌরবের কথা। যে দেশে সাধন-ভজন করিতে হইলেই কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া আলস্যের অবতার বা ভিক্ষুকের সঙ্ঘ-পাল হইতে হয়, সেই দেশে "কাজও করিব, সাধনও করিব" ইহার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "যুদ্ধও কর, ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণও কর", এই উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু আমরা দৈনিক গীতাপাঠ করাকেই সার করিয়াছি, গীতার উপদেশকে নিজ নিজ জীবনে

রূপদান করিবার জন্য আগ্রহী হই নাই। ফলে, গীতার শিক্ষা এই দেশের মানুষকে যাহা করিতে পারিত, দেশের মানুষেরা তাহা হয় নাই। গীতার জ্বলন্ত উপদেশগুলি দেশের যে ভবিষ্যৎ রচনা করিতে পারিত, আমাদের ইতিহাস সম্পূর্ণতঃ না হইলেও প্রধানতঃ তাহার বিপরীত। এই লজ্জা সাধকের দেশ হইতে, সাধকের জীবন হইতে অপসারিত হওয়া প্রয়োজন।

যেই সহরটীতে তুমি এতকাল ধরিয়া চাকুরী করিয়া আসিতেছ, সেই সহরটীর প্রধান নাগরিকেরা প্রায় প্রত্যেকেই স্থানান্তরশীল চাকুরী-জীবী বলিয়া প্রতি বৎসর একই ব্যক্তিদের সঙ্গ, সাহচর্য্য বা সহায়তা পাও নাই। কিন্তু এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জন-সমষ্টির মধ্যেও নিয়ত ঈশ্বরানুরাগ দর্শন করিয়াছ। যখন ঐ পার্ব্বত্য জঙ্গলে প্রায় কোনও সঙ্ঘেরই ধর্ম্মপ্রচারকেরা যাইতেন না, সেই সময় হইতে আমি ধারা-বাহিক ভাবে বৎসরের পর বৎসর কখনও বা দুই চারি ছয় মাস পরে পরে গিয়া অন্তরের সংগুপ্ত প্রেরণাকে ভাবার উৎসমুখে গৈরিক নিঃস্রাবের মতন ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছি। ইহার ফলে ঐ স্থানে দিনের পর দিন ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং একটা অপ্রসিদ্ধ সাধারণ স্থান একটা তীর্থভূমির মর্য্যাদা পাইয়া গিয়াছে। এমন স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া তোমার অন্যত্র যাইতে যে অনাগ্রহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমি তোমার ঈশ্বরানুরাগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ঈশ্বর-সাধনের জয়-জয়কার হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

কলিকাতা

৩রা ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল গিয়াছে রবিবার, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না, এমন কথা বলা চলে। আজ আশ্রমটা একটু ফাঁকা হইয়াছে। মাণিকতলার এই বাড়িটা এত ছোট যে, বেশী জনসমাগম হইলে লোকেদেরও প্রচণ্ড কষ্ট হয়।

আজ তোমার পত্র পাইলাম। পত্রখানা পুপুনকী ও বারাণসী ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছে।

ব্যস্ত হইওনা, নাম করিয়া যাইতে থাক। ভগবানের নাম দেহ-মনের সকল সঙ্কট নাশ করে, সকল আপদ দূর করে। শরীরকে এমন সদাচারে সংরক্ষণ কর যেন অকারণ স্বাস্থ্যহানি না আসিতে পারে। একমাত্র পবিত্রতাবোধের অভাবে দেশকে দেশ জাতিকে জাতি নানা অবচনীয় কুব্যাধির বাসাবাড়ীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দৈহিক সদাচারকে, শারীরিক সংযমকে, আচরণের পবিত্রতাকে কুসংস্কার মনে না করিয়া যত্নতঃ পালন করিতে হয়। শুচিবায়ুগ্রস্ত হইতে বলিতেছি না, শুচি থাকিতে বলিতেছি। অপরিচ্ছন্ন সংস্পর্শ অধিকাংশ রোগের জনক।

দেহে সুস্থ থাকিলে মনে সুস্থ থাকা সহজ হয়, মনে সুস্থ থাকিলে দেহে সুস্থ থাকা সহজ হয়। শুচিতা সুস্থতার সহায়িকা, শুচিতা অনাবশ্যক নহে। যেখানে সেখানে থাকা, যা-তা খাওয়া, যার-তার

সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া সমীচীন নহে। পেটের অসুখ হইল না বা সর্দ্দিকাসি হইল না,—ইহাকেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিও না। তোমার অসতর্কতার ফলে এসব না হইয়াও তোমার অজ্ঞাতসারে রক্তদুষ্টি আসিতে পারে, যাহার ফল বংশানুক্রমিক।

সুস্থ দেহে সুস্থ মনে ভগবানকে ডাকিলে সে ডাক বড় জোরদার হয়, সে ডাক গভীর হয়, নিবিড় হয়। অসুস্থদেহী নিজের রোগের চিন্তা করিয়াই কূল পায় না, ভগবানকে ডাকিবে কখন? কিন্তু স্বাস্থ্য হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া কেবল নিজ অসুস্থতার কথাই ভাবিতে থাকিবে, ইহা বড়ই ক্ষতিকর কথা। অসুস্থ অবস্থায়ও ভগবানকেই ডাকিবে। আর কাহাকে এসময়ে ডাকিতে পার?

ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে মন দেহ-চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ইহাতে দেহ বিশ্রাম পাইবে। ভগবানের ভাবনা করিলে যে দেহের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়, ইহা এক সুপরীক্ষিত সত্য। আর, দেহের চিন্তা করিতেই যদি হয়, তবে কেবল ভাবিবে,—"আমি প্রতিক্ষণে সুস্থ হইতে সুস্থতর হইতেছি, আমার এই দেহকে জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী করিতেছি, আমার সৎসঙ্কল্পের মহিমায় প্রতিটি মুহূর্ত্তে একটার পর একটা করিয়া শরীরস্থ অণু-পরমাণু নিচয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য এক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, যাহার ফলে এই দেহ সর্ব্বদা জগৎকল্যাণ-কর্ম্মেই নিয়োজিত থাকিতে বাধ্য হইবে।" তুমি যে জগতের মঙ্গলকারী ছাড়া আর কিছু হইতে পার না, আর কিছু হইয়া থাকিতে পার না, আর কোনও লক্ষ্য যে তোমার নাই, এই কথাটা বারংবার চিন্তা করিতে থাক। তোমার চিন্তা তোমাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবে।

প্রতি নিমেষে আমাদের মৃত্যু ঘটিতেছে। কিন্তু এই মৃত্যুর বিনিময়ে কোন্ অমৃত আমরা আহরণ করিলাম? যদি জাগ্রত দৃষ্টিতে শরীরের এই স্বাভাবিক মৃত্যুর দৃশ্যটী লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিনিময়ে অমৃতত্ব আদায় করিয়া লইতে পারি। মরিতেছি প্রতিক্ষণে স্বভাবের নিয়মে কিন্তু জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া প্রতিক্ষণে একটী অমর জীবনের অধিকারী আমরা হইতে পারি।

কথাগুলি সুস্পষ্ট, হেঁয়ালি নহে। অভ্যাস করিয়া দেখিলেই সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

কলিকাতা
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার যাহা অবস্থা, তাহাতে তোমাকে একত্ব-সাধনের উপদেশ দিব। ইহাকে শব্দান্তরে একাত্মসাধনও বলিতে পারি। শব্দ হিসাবে দুইটী কিন্তু মর্ম্ম হিসাবে কথা দুইটী এক।

নিজেকে কোনও বস্তু, ব্যক্তি, স্থান বা কাল হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবে না। ঐ যে দূর্ব্বাসুকোমল শ্যামল প্রান্তর, উহা আর তুমি

এক। ঐ যে তারকাখচিত বিরাট আকাশ, উহা আর তুমি এক। ঐ যে বেগবতী স্রোতস্বিনীর অবিরল জলপ্রবাহ, উহা আর তুমি এক। ঐ যে তরঙ্গায়িত ফেনিল সমুদ্র, উহা আর তুমি এক। ঐ যে অতলস্পর্শ গভীর গহ্বর, উহা আর তুমি এক। ঐ যে অভ্রচুম্বী হিমাচল-শৃঙ্গ, উহা আর তুমি এক।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তোমার ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড নামিয়া আসিবে।

মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেবতা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সব তোমার সহিত অভিন্ন।

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, ব্রহ্মা বা শিব সবাই তোমার সহিত অভিন্ন।

এই একাত্মতার সাধন অল্পে অল্পে করিতে হয়, আস্তে আস্তে ইহার অভ্যাস চালাইতে হয়। জোর করিয়া নহে, প্রবল বেগে নহে। কারণ, ধীর চিন্তা তোমার দেহের অণুপরমাণুতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন আনয়নে সমর্থ হইবে, দ্রুত চিন্তার সেই ক্ষমতা অল্প। দ্রুত চিন্তা যতটা ভাঙ্গে, ততটা গড়িতে পারে না। সুধীর সুনিবিষ্ট চিন্তা যতটা ভাঙ্গে, তার চেয়ে বেশী গড়ে।

ছোট্ট একটী বাচ্চা রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। তুমি তাহার সহিত মনে মনে একাত্মসাধন করিতে পার। ফলে তুমি শিশুর স্বভাব পাইতে থাকিবে। কিন্তু পুরুষ হইয়া তুমি একটী নারীর সহিত মনে মনে একাত্মসাধন শুরু করিলে। ইহাতে বিপদ আছে। কোনও নারী নিজেকে তোমার সহিত একাত্মসাধনে যুক্ত করিল, ইহাতেও

বিপদ আছে। যাহাকে দেখিতেছ, তাহার সহিতই নিজেকে অভিন্ন বলিয়া ভাবিতে পার। সে ত কদাপি জানিতেও পারিবে না যে, তুমি তাহাকে দেখিয়া তাহার সহিত নিজের একত্ব-ভাবনা করিয়া যাইতেছ, কিন্তু তুমি ত জানিবে! নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিমান করিতেছ, অপরকে নারী বলিয়া জানিতে পারিতেছ,—এইরূপ ক্ষেত্রে একত্ব-ভাবনার দ্বারা অকারণ রিপুর উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং ইহা হইতে বিরত হইবে।

কিন্তু স্বামী ও পত্নী নিজেদের মধ্যে এই একত্ব-সাধন অনায়াসে করিতে পারেন। পারেন বলিব কেন, করিতে গেলে লাভবান হইবেন। চখের সহিত চখ, মুখের সহিত মুখ, বুকের সহিত বুক, পিঠের সহিত পিঠ, হাতের সহিত হাত, পায়ের সহিত পা মিলিয়া গিয়া যখন একত্ব-বোধ সম্পূর্ণ হইবে, তখন একাত্ম-বোধ আসিয়া যাইবে। অর্থাৎ তখন দুইজনের দুই দেহ মিলিয়া এক হইয়াছে, ইহাই মাত্র অনুভূতি-গম্য হইবে না, তখন দেহ-বোধ দেহি-বোধে বিলীন হইবে, আত্মার সহিত আত্মার মিলনের আনন্দ উপলব্ধিগত হইবে, তখন কে পুমঙ্গী কে স্ত্রীলিঙ্গী এই প্রশ্নের বা এই সংস্কারের রেখামাত্র মনের মধ্যে থাকিবে না। স্ত্রীপুরুষের একত্ব-সাধন একমাত্র স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যেই অনুশীলনীয়, অন্য সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত বা নিঃসম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নহে।

তান্ত্রিকদের অনুষ্ঠিত অনেক প্রক্রিয়ার আসল উদ্দেশ্য অনেকটা এই রূপ। কিন্তু তোমাকে যে অনুশীলনের কথা বলিলাম, তাহার সহিত দৈহিক ব্যাপারের কোনও সংস্রব নাই। ব্যাপারটা সম্পূর্ণই মানসিক।

মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা মনকে মনের উর্দ্ধস্তরে ঠেলিয়া তুলিবার ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া, শারীর-শুচিতার শুভফলে বিশ্বাস রাখিয়া, তোমার ব্যক্তিগত মঙ্গলামঙ্গলের সহিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকলের মঙ্গলামঙ্গল বিজড়িত রহিয়াছে, এই সত্যে বিশ্বাস রাখিয়া একাত্ম-ভাবনা করিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ কলিকাতা
৬ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা সমবেত উপাসনার কাজটী দুর্জ্জয় সঙ্কল্প সহ প্রতি সপ্তাহে চালাইয়া যাইতে থাক। সঙ্কল্প তোমাদের এই হউক যে, উপাসনার মাধ্যমে মানবে মানবে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে সম্প্রীতি আনয়ন করিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন, একথায় যাহার আস্থা আছে, সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান, একথায় যাহার বিশ্বাস আছে, ওঙ্কার ভগবানের অসাম্প্রদায়িক নাম, একথায় যাহার শ্রদ্ধা আছে, তাহাকেই সমবেত উপাসনার আসরে আদর করিয়া স্থান দিবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে,—"আপনার বারোয়ারী পথে আমার বিশ্বাস নাই।" তাহাদিগকে ডাকাডাকি করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাদের বিশ্বাস আছে, কেবল তাহাদের উপস্থিতিটুকু সম্ভব করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারাও অনেকে আসে না। তাহার অনেক কারণের মধ্যে অতি প্রধান একটা কারণ এই যে, তোমরা যাহারা সমবেত উপাসনায় আস, তাহারা আরও নিষ্ঠাবান্, আরও একাগ্র হইতে পার নাই। লোহা চুম্বক হইতে পারে নাই। যেই মুহূর্ত্তে লোহা চুম্বক হইবে, সেই মুহূর্ত্তে চারিদিকের লৌহখণ্ডগুলি অপ্রকাশিত প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া তোমাদের সহিত যুক্ত হইবে।

সমবেত উপাসনার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, তুমি তোমার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ব্যক্তিগত উপাসনা করিতে পারিবে না। বরং ইহার বিপরীত। সপ্তাহে একদিন একবেলা সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনা করিবে, সপ্তাহে সাত দিনে সাতাইশ বার বসিয়া নিজ ব্যক্তিগত নিভৃত উপাসনা করিবে। নিভৃত উপাসনায় তুমি নিজের মঙ্গলই নিজে করিতেছ, অন্য সঙ্গীর প্রয়োজন নাই। কদাচিৎ অন্যের সঙ্গে মিলিয়া ব্যক্তিগত উপাসনা করিলেও তাহাতে সঙ্গীর সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধন মনে মনেই করিয়া যাইতেছ, বাহিরে কোনও বাক্‌স্ফূরণ বা হৈ-চৈ নাই। স্বামী ও স্ত্রী এইরূপ উপাসনায় পরস্পরের সঙ্গী হইতে পারে অথবা দুই বন্ধু বা চারি বন্ধু এইরূপ উপাসনার সঙ্গী হইতে পারে। এরূপ স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রী বা পুরুষের আসিবার প্রয়োজন নাই। কয়েকজন স্ত্রীলোক

মিলিয়া নীরবে এরূপ নিভৃত ব্যক্তিগত সাধন করিলে করিতে পারে। কয়েকজন পুরুষ মিলিয়াও নীরবে এরূপ নিভৃত ব্যক্তিগত সাধন করিলে করিতে পারে। কিন্তু বহু নারী ও বহু পুরুষ মিলিয়া ইহা করিতে পারে না। বহু পুরুষ ও বহু নারী মিলিলে তাহাকে সুপ্রকাশ্য সমবেত মূর্ত্তি দিতেই হইবে। নতুবা কালে ভদ্রে অনাচার প্রবেশ করিতে পারে।

জন্মোৎসবাদির সময়ে তোমরা নীরবে এরূপ জপযজ্ঞ করিয়া থাক। উপস্থিত স্ত্রী বা পুরুষের সংখ্যার কোনও সীমা নাই, কিন্তু সবাই নীরবে, মৌনী থাকিয়া, একাগ্রতা সহকারে নামজপ করিয়া যাইতেছ। এই সাধন গভীর হইতে পারে কিন্তু ইহাকে নিভৃত সাধন বলিব না।

ব্যক্তিগত সাধনা নিভৃতই হইতে বাধ্য, নিভৃত হইলেই তাহা ফলপ্রসূ। তোমরা সপ্তাহে একদিন সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছ বলিয়াই যে তোমাদের ব্যক্তিগত উপাসনার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহা নহে। বরং ব্যক্তিগত নিভৃত উপাসনাকে বলশালিনী করিবার জন্যই সমবেত উপাসনার প্রয়োজন, আবার সমবেত উপাসনাকে প্রাণবন্ত করিবার জন্যই ব্যক্তিগত নিভৃত উপাসনা প্রয়োজনীয়। একটীর দ্বারা অপরটীর অনুপূরণ হইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা হইতেছে তোমার সহিত পরমপ্রভুর সুঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে বা সেই সম্বন্ধকে নিঃশেষে আস্বাদনে। সমবেত উপাসনার প্রয়োজন ও সার্থকতা হইতেছে বিশ্বের সকলের সহিত নিজের আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া এবং সেই আত্মীয়তাকে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

আস্বাদন করিয়া বিশ্বপ্রভুর সহিত নিজেদের সম্বন্ধ স্থাপনে এবং সেই সম্বন্ধকে আস্বাদনে। ব্যক্তিগত উপাসনা যেন ভূমিকে গভীর করিয়া কর্ষণ, সমবেত উপাসনা যেন ভূমিকে ব্যাপক করিয়া কর্ষণ। একটা আর একটার মুখাপেক্ষী, একটা আর একটার পরিপূরক।

এই জন্য নীরব জাপককেও দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া কখনও স্তোত্র-পাঠ করিতে কখনও বা নাম-কীর্ত্তন করিতে দেখা যায়।

মনে রাখিও, শুধু স্তোত্রপাঠ বা শুধু কীর্ত্তন অপেক্ষা সমবেত উপাসনা মহত্তর স্তরের আধ্যাত্মিক অনুশীলন। যে যাহাই বলুক, তোমরা সমবেত উপাসনায় অনাদর করিও না।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে "বারোয়ারী" শব্দটার প্রয়োগ খুব সুবিবেচিত ব্যাপার হয় নাই। সমবেত উপাসনা "বারোয়ারী" ব্যাপার নহে, ইহার সম্ভ্রম অভ্রভেদী এবং অতলস্পর্শ। তোমরা সমবেত উপাসনার কৌলীন্যে বিশ্বাস করিও।

আমি যেখানে যাহার সম্পর্কে যে কাজ করিয়া যাইতেছি, তাহা নিতান্ত নির্ব্যক্তিক হইয়া করিতেছি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমার ধর্ম্মদেশনা নহে। এই জন্যই গায়ে পড়িয়া কাহাকেও আমার মত ও পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা আমার জীবন-মধ্যে নাই। যে যে-ভাবে পারে, নিঃশ্রেয়স কুশল লাভ করুক, তাহার মত ও পথের প্রতি কদাচ আমার সম্মাননা-বোধের অভাব ঘটিবে না। অপরের মত ও পথকে আমি সম্মান করি বলিয়াই, আমার সহিত যাহারা একমত নহে, তাহাদিগকে হেলার দৃষ্টিতে বা তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখি না। নিজের মত অপরের উপরে চাপাইতে চাহি না বলিয়াই আমার মনে অবজ্ঞার

ভাব নাই। কেহ আমার মত পছন্দ করে না, ভাল কথা অন্য কোনও একটা মত সে পছন্দ করে। যে মত সে পছন্দ করে, সেই মতে সে চলুক। ঐ পথেই তাহার কল্যাণ হউক। তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আমারই মতে আমারই পথে টানিয়া আনিতে হইবে, এইরূপ জিদ বা জবরদস্তির আমি সার্থকতা দেখি না।

সমস্ত মন সমস্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়া তোমরা নিজেদের গুরু-নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ কর। অপরে "বারোয়ারী" আখ্যা দিয়াছে বলিয়াই আমাদের সমবেত উপাসনা নিতান্ত হাটে বাজারে সুলভ্য সাধারণ জিনিষ হইয়া যায় নাই।

এই উপাসনা শূদ্রকে ব্রাহ্মণ্য দিতে চাহিতেছে। কিন্তু শূদ্রেরা ব্রাহ্মণত্ব চাহে না, চাহে দীর্ঘকালের অবহেলার প্রতিশোধ।

ব্রাহ্মণোচিত অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা-বুদ্ধিতে তাকাইতে শূদ্রনন্দনদিগকে সাহস দিতেছে প্রতিশোধ স্পৃহা।

অন্য দিকে, অপরেরা প্রণব-গায়ত্রীতে অধিকার কেন পাইয়া যাইবে, এই মনোদুঃখে বিরূপ হইয়া উঠিতেছে ব্রাহ্মণ-কুলতিলকেরা।

গিরিবর্ত্মের এই দুই তীক্ষ্ণাগ্র উদ্গত পর্ব্বতের গাত্রভেদ করিয়া দুঃসাহস সহকারে তোমরা অগ্রসর হইয়া যাও। থামিবে না বলিয়া যে পণ করিয়াছে, লক্ষ্যে পৌছিতে তাহার দেরী হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

কলিকাতা

৬ই ফাল্গুন ১৩৭১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

স্বামীকে সেবা দিয়া বশীভূত করিতে হয়। অন্য কোনও মন্ত্র নাই। তবে অনেক স্বামী সেবার মর্ম্ম বোঝে না। সেই সকল স্থলে ধৈর্য্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়। সেবা ও প্রতীক্ষা এই দুইটী শক্তি যাহার করধৃত, সেই পত্নী পরিণামে অঘটন ঘটাইয়া থাকে।

নারী যে পুরুষের শক্তি, এই কথা অনেক স্বামীর স্মরণে থাকে না। নারী কেবলই কিঙ্করী নহে, প্রভুও বটে। তার প্রভুত্বের প্রকাশ দাম্ভিকতার মধ্য দিয়া নহে, বিনয় ও নম্রতার মধ্য দিয়া। নম্রতার যে শক্তি, দর্প দম্ভের সে শক্তি নাই। গর্ব্বিতা পত্নী গৃহের শোভা নহে, গৃহের আপদ।

নিজের ভিতরে দিনের পর দিন কেবল নিত্য নূতন সদ্‌ভাবের সমাহার করিতে থাক। ইহাতেই তোমার দুঃখনিশার অবসান হইবে।

কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইও না। কোনও অবস্থাতেই ভগবানকে ভুলিও না। ভগবান তোমার সর্ব্বস্ব হউন। ভগবানকে নিয়ত স্মরণ করিলে তিনি তোমার মেরুদণ্ডে শক্তির সঞ্চার করিবেন। বিশ্বাসে বল বাড়ে, বিশ্বাসে ধৈর্য্য বাড়ে। বিশ্বাস জীবনের পরম সম্বল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

বাটানগর

৮ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নাম-কীর্ত্তন সম্বন্ধে তোমাদের নানা জনের প্রশ্নের অন্ত নাই। সেই সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে তোমাদের দারুণ বিভ্রান্তি ঘটিতে পারে। সব চেয়ে মারাত্মক কথা হইতেছে এই যে, নিজেরা যেই বিষয় বুঝিতে পার নাই, সেই বিষয়ে মতভেদ অনেক ক্ষেত্রে আত্ম-কলহ-পরিণামী হইতে দেখা গিয়াছে।

কীর্ত্তন কি? ভগবানের প্রশংসা উচ্চারণ করার নাম সাধারণ অর্থে কীর্ত্তন। ইহা সুরসহযোগে হইতে পারে, বিনা সুরেও হইতে পারে। ইহা পদ্যেও হইতে পারে, গদ্যেও হইতে পারে। কিন্তু নাম-কীর্ত্তন বলিতে সুরসহযোগে বারংবার নামোচ্চারণ বুঝিতে হইবে। কোন্ নামের কীর্ত্তন? যে নামের কীর্ত্তন করিলে তোমার ইষ্ট-বা বীজমন্ত্রের বারংবার স্মরণ ও উদ্দীপন ঘটিবে। বীজমন্ত্র মুখে উচ্চারণ নিষেধ, অন্যকে শোনান নিষেধ কিন্তু কীর্ত্তনীয় নাম উচ্চৈঃস্বরে এবং সকলকে শুনাইয়া করা যায়। অথবা কীর্ত্তনীয় নাম সকলকে শুনাইয়া করাও প্রয়োজন।

যেই ব্যক্তি নামকীর্ত্তন করিল না কিন্তু শুনিল, সে আধ্যাত্মিক ভাবে লাভবান হইল। এই হিসাবে কীর্ত্তন করিয়া এবং অপরকে শুনাইয়া তুমি পরোপকার করিলে।

যাঁহার জপনীয় নাম রাম বা কৃষ্ণ, যাঁহার জপনীয় বীজ রাং বা ক্লীং, তাঁহার পক্ষে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের নাম-কীর্ত্তন লাভজনক। কারণ, তাহাতে তাঁহার বারংবার ইষ্টস্মৃতির উদ্দীপন ঘটে, বারংবার বীজমন্ত্র স্মরণে পড়ে। কিন্তু যাঁহার জপনীয় নাম শিব বা কালী বা দুর্গা বা লক্ষ্মী, যাঁহার জপনীয় বীজ হুং বা ক্রীং বা দুং বা শ্রীং, হরেকৃষ্ণ হরেরামাদি ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের নামকীর্ত্তনে বা ঐ কীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহাদের ইষ্ট-উদ্দীপনের বা বীজমন্ত্র-স্মরণের সহায়তা হয় কি না, তাহা ঐ ঐ মন্ত্রের সাধকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনকেই প্রধান রূপে তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কীর্ত্তনে মাতিয়া যাওয়া, কীর্ত্তন-কালে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়া, অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্প ইত্যাদির আবির্ভাব হওয়া, এই মতানুসারে অতীব প্রশংসনীয় ব্যাপার। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে নর্ত্তন, কুর্দ্দন, আলিঙ্গন, ধূল্যবলুণ্ঠন, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ অতীব উন্নত ব্যাপার বলিয়া এই মতানুসারে সম্বর্দ্ধনা পাইয়া থাকে।

নাম-কীর্ত্তনের এই বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির আদি প্রচারক ও প্রচালক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হইলেও ইহার উন্মাদনা অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও বিস্তারিত হইয়াছে এবং আমি রামনাম-গায়কদের মধ্যে মহাভাবে উদ্বেলিত হনুমান্-অভিমানী ভক্তকে উদ্দণ্ড উল্লম্ফন করিতে করিতে মূর্চ্ছা পাইতেও দেখিয়াছি।

কীর্ত্তনটাই যেখানে সাধন বা একমাত্র সাধন, সেখানে কীর্ত্তনের এই উচ্ছ্বাসময় রূপ অপ্রত্যাশিতও নহে, অশোভনও নহে।

কিন্তু আমাদের ব্যাপার আলাদা। আমরা কর্ম্মকে ভজনের বিরোধী জ্ঞান করি না, জ্ঞানকে ভক্তির শত্রু মনে করি না, নিবিষ্ট মননকে সাধনের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা বলিয়া প্রত্যয় রাখি, অথচ কীর্ত্তনকেও আবশ্যকীয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমরা ওঙ্কারের স্মৃতি-উদ্দীপক নাম-কীর্ত্তন করি, করা লাভজনক জ্ঞান করি। কীর্ত্তন করিয়া যদি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেই হয়, নিজ নিজ বীজমন্ত্র স্মরণের সহায়ক কীর্ত্তনই সঙ্গত। অন্য কীর্ত্তন করিলে বা শুনিলে পাপ নাই, কারণ শব্দমাত্রেই ব্রহ্ম! কিন্তু নিজ নিজ নামে নিষ্ঠা দ্বারা সাধক বেশী লাভবান হন।

হরিওঁ-কীর্ত্তনে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের যোগ দিতে বাধা নাই, বাধা হইতে পারে না। কারণ, হরি শব্দের মানে পরমেশ্বর, ওম্ শব্দের মানে হাঁ, তিনি আছেন। পরমেশ্বর বলিতে যে যাহাই বোঝ, তিনি আছেন। হরিওঁ কোনও নির্দ্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়-বিশেষের নাম নহে, সকল সম্প্রদায়ের সকল নামের স্বীকৃতি। সুতরাং যিনি ওঙ্কার মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই তাঁহার পক্ষেও এই নামকীর্ত্তন নিজ সাধনের রুচিবর্দ্ধক। হরি বলিতে এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিতয়ের একতমকে বুঝান হয় নাই; যাঁহার ভিতরে বিশ্বের সব-কিছু সমাহৃত হইয়া আছে, তাঁহাকে বুঝান হইয়াছে। একজন অখণ্ডের পক্ষে হরিওঁ এই নামের আরও একটী ব্যাখ্যা হইতে পারে। তাহা হইতেছে পরমেশ্বরই প্রণব, প্রণবই পরমেশ্বর। যিনি অখণ্ড নহেন, তিনি এই ব্যাখ্যা নাও করিতে পারেন, নাও মানিতে পারেন। এই ব্যাখ্যা কাহাকেও মানিতে বাধ্য করিবারও প্রয়োজন নাই। হরি মানে পরমেশ্বর, ওঁ মানে yes, হাঁ, আছেন,—ইহা যে-কাহারও পক্ষে যথেষ্ট।

এই একটী কারণেই কোনও প্রচারণার প্রয়াস ব্যতীতই হরিণ্ড-নাম-কীর্ত্তন দিকে দিকে বিদ্যুদ্বেগে চালু হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কৃষ্ণ বলিতে যাঁহাকে বুঝায়, তিনি পরমেশ্বর কি না, বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারে, অবিশ্বাস করিতে পারে। রাম বলিতে যাঁহাকে উপলক্ষিত করা হয়, তৎসম্পর্কেও ইহাই কথা। দীক্ষাসূত্রে যিনি কৃষ্ণমন্ত্র বা রামমন্ত্র পাইয়াছেন, বিশ্বাস না হইলেও তাঁহাকে সাধন-পথে অগ্রগমনের দায়ে পড়িয়াই রাম বা কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতে হইবে. নতুবা তাঁহাকে সাধনমার্গ-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সকল বীজমন্ত্রই দীক্ষামূলে প্রচারিত হইতেছে বলিয়া, ঐ বীজমন্ত্রকে জীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজনে, দীক্ষা পাইবার পরে ঐ মন্ত্রের অনুকূল ধর্ম্মগ্রন্থ, শাস্ত্র বা দার্শনিক মতবাদকে অন্ধের মত স্বীকার করিয়া নিতে হইতেছে। দীক্ষা নিবার পরে কেহ যদি দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রের সমর্থনকারী দার্শনিক মতবাদকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জ্জরিত করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার সাধন-জীবন মাটি হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে একদা যে অমৃতময় আস্বাদন অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, বিচার-বিতর্কের তরঙ্গাঘাতে তাহা দূরাতিদূরে সরিয়া পড়ে। ইহারই দরুণ দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধককে নিজ যুক্তিবুদ্ধির বিরুদ্ধে হইলেও সাধনের রুচিবর্দ্ধক আপাততঃ অযৌক্তিক নির্দ্দেশগুলি মানিয়া চলিতে হয়। স্বাধীন বিচার-শক্তি এবং সাধনপথানুসরণের শান্তি এই দুইয়ের সংঘর্ষে অনেক ভাল ভাল নৌকা ঝড়ের মুখে বানচাল হইয়া গিয়াছে, ইহা সত্য।

অন্যেরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন করেন বলিয়াই তোমরাও তাহাই করিবে, ইহা আমার নির্দ্দেশ নহে। কীর্ত্তন যাহাতে তোমার

ধ্যানাভিনিবেশের সহায়ক হয়, তেমন ভাবে করিবে। নাতিমৃদু নাতি-উচ্চ কীর্ত্তনই আমার মতে শ্রেয়ঃ। কীর্ত্তন শান্ত সমাহিত ভাবে করিবার চেষ্টাই ভাল। তবে, উদয়াস্ত কীর্ত্তন বা অহোরাত্র কীর্ত্তন বা নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিবার কালে মাঝে মাঝে ভাবের প্রবল উদ্দীপনা নর্ত্তন-কুর্দ্দনাদির প্রশ্রয় দিলে, তাহা দোষের নহে। কীর্ত্তনটাই তোমাদের সাধনা নহে, ধ্যাননিবিষ্টতাই তোমাদের সাধনা।

মনে রাখিও. তোমাদের সাধনে কি অপরূপ বস্তু আছে। গুরুকে পূজা করাই তোমাদের লক্ষ্য নহে, সদ্‌গুরুর নিত্য সান্নিধ্য নিয়ত উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রেরণায় প্রবল উদ্যমে সাধন করিয়া যাওয়া তোমাদের লক্ষ্য। কাহাকেও অবতার বলিয়া পূজা করা বা প্রচার করাই তোমাদের লক্ষ্য নহে, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে পরমেশ্বরের অবতরণ সম্ভব করিয়া তোলাই তোমাদের লক্ষ্য। অতি প্রাচীন কালের তপঃসাধনাকে তিনটী তুড়িতে উড়াইয়া দিয়া কেবল কীর্ত্তন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া দেওয়াই তোমাদের লক্ষ্য নহে, তোমরা প্রচণ্ড সঙ্কল্পের বলে ব্রাহ্মণত্বও অর্জ্জন করিবে, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য নিজেদিগকে উৎসর্গও করিবে, সকল মন্ত্রের সমন্বয় যেই মহামন্ত্রে তাহার সাধনও করিবে, নাম-সাধন-কালে সূক্ষ্ম সহজ স্বাভাবিক প্রাণায়ামও অভ্যাস করিবে, সমাবিষ্ট হইয়া কর্ম্মও করিবে, কর্ম্ম করিতে করিতে সমাধিও অর্জ্জন করিবে।

বৈদিকের যজ্ঞধূম, তান্ত্রিকের বামাচার, মাত্র এই দুইটী জিনিষকেই আমি আমার সাধন-মার্গের অঙ্গীভূত করিতে পারি নাই। নতুবা এই সাধনে অতীতের সমস্ত সাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ও দিব্য প্রাপ্তির সমাহার

ঘটিয়াছে। তোমরা ধ্যান, জপ, কীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী গান এবং জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প সবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে করিয়া যাইবে।

তোমার যাহাতে ইষ্ট-উদ্দীপন হয় না, তেমন কীর্ত্তনে গিয়া গায়ক বা শ্রোতা রূপে যোগদান করিলে পাপ হইবে না সত্য কিন্তু লাভও ত হইবে না। পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দিতে পার। বাধা কি? বাধা এমন অনুষ্ঠানে, যাহা রুচিবিগর্হিত, নীতি-বিগর্হিত, অসদাচারদুষ্ট। কর্ত্তাভজারাও বৈষ্ণব কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কি তাহাদের সাধনচক্রে বসিয়া কদাচার দেখিয়া ভৈরব হুঙ্কারে প্রতিবাদ করিয়া স্থানত্যাগ করেন নাই? ধর্ম্মের নাম করিয়া যাঁহারা মদ্যপান করিবেন, তাঁহারা তান্ত্রিকই হউন বা খ্রীষ্টানই হউন, তোমার পক্ষে সৎসঙ্গ নহেন। শাস্ত্র-ব্যাখ্যার নাম করিয়া যাঁহারা পরনিন্দা করিবেন, তাঁহারা বৈষ্ণবই হউন আর বৈদান্তিকই হউন, তোমার পক্ষে বর্জ্জনীয়।

যে-কোনও কীর্ত্তনই হউক না কেন, বারংবার শুনিতে শুনিতে কীর্ত্তিত নাম মনের ভিতরে খোদাই হইয়া বসিয়া যায়। যে নাম-কীর্ত্তন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তোমার ইষ্টনামের উদ্দীপনা করিবে, সেই নামের কীর্ত্তন দীর্ঘকাল বসিয়া শুনিলে তোমার অশেষ লাভ। কিসে তোমার লাভ, তাহা বিবেচনা করিয়া চলাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। নশ্বর জীবনের সময়টুকু বড়ই সঙ্কীর্ণ ও অনিশ্চিত। একথা স্মরণে রাখিয়া প্রত্যেকের চলা প্রয়োজন।

যতক্ষণ বাঁচিব, ইষ্টনামই করিব, অন্যদিকে মন দিব না,—ইহাই কর পণ। এই পণ রক্ষা করিতে করিতে যেখান দিয়া যত সম্প্রদায়ের

যত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান বা সহযোগ করিতে পার, কর। আমাদের মতে ছাড়া অন্য মতে যাঁহারা চলিবেন, তাঁহারা নরক ভুগিবেন, এই জাতীয় গ্রাম্য কুসংস্কার আমাদের নাই। অন্য মতের লোকেরা সত্যই নরকে পচিবেন কি না বা পচিতেছেন কি না, তাহা নরকে গিয়া তুমি, আমি বা অপর কেহ দেখিয়া আসি নাই।

প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মতে গভীর বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। বিশ্বাস হইতে নিষ্ঠা অর্থাৎ সহস্র বাধার মধ্যেও লাগিয়া থাকার শক্তি আসে। নিষ্ঠার ফলে সাধনে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জ্জিত হয়।

অপরের সাথে তাল দিতে গেলে যদি তোমার নিজ মত ও পথের প্রতি তোমার নিষ্ঠা কমিয়া যায়, তবে ত সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। নিজের মতে ও পথে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত চলিতে গেলে যদি অপরের সাথে তাল দেওয়ার বাধা ঘটে, তবে তোমার উপরে বিরক্ত হইবার অধিকার সেই অপর ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও নাই। ধর্ম্মীয় ব্যাপার কাহারও ছেলেমেয়ের বিয়া-শাদী নহে যে দশজনের খুশীর দিকে তাকাইয়া করিতে হইবে। সাধন-ভজন এবং তাহার অনুকূল ধর্ম্মীয় ব্যাপারগুলি প্রধানতঃ তোমার ব্যক্তিগত, পরোক্ষতঃ তোমার সমসাধকদের সহিত সম্মিলিত, দূরতঃ বিশ্বের প্রতিজনের কল্যাণের সহিত বিজড়িত। তোমার সাধন জগৎ-কল্যাণের সাধন বলিয়া ইহা জগজ্জনের হিতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু তুমি নির্দ্দিষ্ট দিনে বা সময়ে নিজের সাধন পরিহার করিয়া পরের চরখায় তেল দিতেছ দেখিলে, তোমার যাহারা মঙ্গলকামী, এমন ব্যক্তিমাত্রই মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইবেন।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

নিজের সাধন নিজে পূর্ণমাত্রায় করিয়া যাইবে কিন্তু অপরের সাধনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে না, ইহাই হইবে তোমার নীতি। অপরকে তাহার সাধনে লাগিয়া থাকিতে উৎসাহিত করিবে কিন্তু নিজের সাধনের কোনও ক্ষতি হইতে দিবে না, ইহাও হইবে তোমার নীতি। লোকের কাছে বাহাদুরী করিবার জন্য তোমাদের অনেকে স্বকীয় আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া অন্যদের ব্যাপারে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাও, এমন কুদৃষ্টান্ত সত্যই আছে।

সম্প্রতি হুগলী কি বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামের ছেলেরা এমন কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে, যাহার মধ্যে অখণ্ড-সাধনার ছন্দাংশমাত্রও নাই। কিন্তু পরিশিষ্টে একটী গানের মজলিশ ছিল, যাহাতে আমার রচিত কয়েকটী গান পরিবেশন করা হয়। ছেলেরা আত্মপ্রসাদে অধীর হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছে যে, তাহারা অখণ্ড-আদর্শের প্রচার করিতেছে।

ছেলেরা মনে মনে আমার কাছে প্রশংসা পাইবার প্রত্যাশা করিতেছিল কিন্তু আমি তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিতে পারি নাই। কোনও একটা সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের এক কোণায় "খণ্ড আজিকে হোক অখণ্ড" গানটী গাহিয়া গেলেই অখণ্ড-আদর্শের প্রচার করা হয় না। অখণ্ড-আদর্শ প্রচার করিতে হইলে অখণ্ড মেরুদণ্ড চাই, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াও নিজের আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখা চাই।

খাতির রক্ষা করা আর ধর্ম্মকার্য্য করা এক কথা নহে। ধর্ম্মকার্য্য নিতান্তই আত্মিক ব্যাপার, যদিও সমাজের উপরে তাহার শুভ প্রভাব

আছে। খাতির রক্ষা নিতান্তই সামাজিক ব্যাপার, আত্মিক উন্নতির উপরে তাহার ঘনিষ্ঠ প্রভাব অনেক সময়েই থাকে না। কাহাকেও অকারণে রুষ্ট করিবে না, এই পণ কর কিন্তু খাতির রাখিতে গিয়া নিজের ধর্ম্মবল কদাচ কমাইও না।

ধর্ম্মে যেখানে আচার-অনুষ্ঠানের অতি-বাহুল্য, সেখানে ধর্ম্ম লোক-দেখানো সামগ্রীতে পরিণত হয়। ধর্ম্মে যেখানে উপলব্ধির সম্মান সর্ব্বোচ্চ, সেখানে আচার-অনুষ্ঠানের অনাবশ্যক বাহুল্য আপনা আপনি হ্রাস পায়। আচার-অনুষ্ঠান ও উপলব্ধি উভয়ই শুচিতার অপেক্ষা রাখে। দেহে, মনে, বাক্যে সর্ব্বদা শুচি থাকিবার চেষ্টা করিবে।

উপলব্ধিমান্ পুরুষ কদাচ সম্মানের অভিলাষী হন না। কীর্ত্তন করিয়া দশায় পড়িলে হাজার লোকে অতিশূদ্র চণ্ডালেরও পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, দশায় পড়িবার ইহাই যেন প্রেরণা না হয়। মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় জনতা আসিয়া উপলব্ধিমান্ পুরুষের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, উপলব্ধি লাভের প্রেরণা যেন ইহা হইতে তুমি সংগ্রহ না কর। প্রতিপত্তিলুব্ধের উচ্চোপলব্ধি ক্ষণকালস্থায়ী। এ প্রশ্ন আজ অনেকেই কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে করিতেছে যে, অমুকে সাত দিন সাত রাত্র হরিনামকীর্ত্তন করিয়া আসিল, তার পরের দিনই সে চোরা-কারবার করিয়া ধনসঞ্চয়ে কি করিয়া আগ্রহী বা প্রবৃত্ত হইতে পারে? এ প্রশ্নও হইয়েছে যে, অমুকে অণিমা লঘিমা আদি সিদ্ধি অর্জ্জন করার পরেও অতি জঘন্য কুকাণ্ড করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইল কেন?

ধর্ম্ম আর ধর্ম্মের ভান এক কথা নহে। যে ধর্ম্ম করিতে চাহ, সে ভুলিয়া যাও যে, তোমার দিকে জগতের একটা কাণা চোখও তাকাইয়া

আছে। অপরে তোমাকে দেখিতেছে ভাবিলেই তুমি তার কাছে ভাল হইবার চেষ্টা করিবে, নিজের কাছে নহে। নিজের কাছে যে ধার্ম্মিক বা সাধু নহে, সে অপরের তারিফ পাইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর হইয়া যায় নাই। পরপ্রশংসা-লুব্ধেরা বড় খেলো নীতিজ্ঞান নিয়া চলে। সৎকাজে যদি পরের প্রশংসা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সৎ-কাজও করিতে সম্মত হয় না। গর্হিত কাজ করিয়াও যদি লোকপ্রশংসা মিলে, তবে তাহাতে তাহাদের সরম নাই। কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ, তাহা যেখানে বুঝিতে অক্ষম হইবে, সেখানে বিচারে বসিও, কোন্‌টাতে তোমার বেশী লাভ, স্থায়ী লাভ আর কোন্‌টাতে তোমার কম লাভ ক্ষণিক লাভ। স্থায়ী এবং বেশী লাভের দিকে তাকাইয়াই কাজ করিও।

সাংসারিক ও ধার্ম্মিক, এই উভয়বিধ ব্যাপারের জন্যই তোমাদের প্রতি আমার ইহাই উপদেশ।

নামকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন ধ্যানাবেশ আসিয়া যাইবে, তখন কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিবে, ধ্যানে ডুবিয়া যাইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্দাম আনন্দে উচ্ছল ভক্তদের নৃত্যপর চিত্র বড় সুন্দর কিন্তু ধ্যান-প্রশান্ত সাধকদের স্থির নিশ্চল স্নিগ্ধ মূর্ত্তিগুলি আরও মধুর, আরও সুন্দর। পূর্ব্বোক্ত ছবি কিছুকাল মনের ভিতরে জাগিয়া থাকে, শেষোক্ত ছবি থাকে দীর্ঘকাল এবং কখনো কখনো হয় সুগভীর ধ্যানের সহায়ক।

জপ করিতে করিতেও ধ্যান আসে। সুতরাং কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন মনে আবেশ আসিয়া গেল, তখনি কণ্ঠকে শুদ্ধ করিয়া দিয়া স্বাভাবিক শ্বাসে আর প্রশ্বাসে নাম জপিতে সুরু কর।

নাম জপিতে জপিতে যখন ধ্যানের প্রবাহ সুরু হইয়া গেল, তখন দেহমন পরমেশ্বরে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।

কলির জীব ধ্যানে অধিকারী নহে, এরূপ যুক্তি তোমাদের জন্য নহে।

কীর্ত্তন করিতে গেলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত উচ্চ চীৎকার ছাড়িবে না, এরূপ যুক্তিও তোমাদের জন্য নহে।

পেট ভরিয়া খাইতে হইলে নিমপাতা ভাজা, বেগুন পোড়া, ডাল, তরকারী, চাটনি প্রভৃতি সবই যেমন কিছু কিছু দরকার, ঠিক তেমনি জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রত্যেকটাই সাধকের সাধন-পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়। ঈশ্বরে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়াই আসল কথা। শুধু নিমপাতা ভাজা দিয়া কি পেট ভরান যায় না? যায়। শুধু চাটনি দিয়াও তাহা চলে। কিন্তু পঞ্চব্যঞ্জনের সুষম প্রয়োগ অধিকতর প্রীতিকর ও হিতকর।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির পারস্পরিক কলহকেও দূর করিতে হইবে। যাহা ভক্তির বর্দ্ধক, এমন কর্ম্ম কেন করিব না? অথবা জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্মই এমন ভাবে কেন করিব না, যাহাতে তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভক্তির উপচয় ঘটে? যাহাতে জ্ঞানের উদয় হয়, এমন কর্ম্ম কেন করিব না? অথবা জীবনের প্রত্যেকটী কর্ম্মই এমন ভাবে কেন করিব না, যাহাতে তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে? জ্ঞানকে ভক্তি হইতে এবং ভক্তিকে জ্ঞান হইতে কেন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিব? ভক্ত হইতে হইলেই অন্ধ হইতে হইবে, জ্ঞানী হইতে হইলেই ভক্তিকে উড়াইয়া দিতে হইবে, ইহার কোন্ প্রয়োজনীয়তা

আছে? পরমেশ্বর সীমাবদ্ধ হইয়াও যদি অসীম হইতে পারেন বা অসীম অনন্ত হইয়াও সসীম সান্ত হইতে পারেন, তবে আমিই বা জ্ঞানী হইয়া ভক্ত হইতে কেন পারিব না, ভক্ত হইয়াও জ্ঞানী হইতে কেন অসমর্থ হইব?

কর্ম্মকে অনাবশ্যক বলিয়া ধরিয়া লইয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোল বাঁধান হইয়াছে। কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞানও হইবে না, ভক্তিও হইবে না। কোনও কোনও কর্ম্ম যদি জ্ঞানের বা ভক্তির উদয়ে সহায়ক হইতে পারে, তবে কেন আমরা চেষ্টা করিব না যে, আমাদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির পুষ্টি-বিধান করুক?

অন্ধভক্তিতে কর্ম্ম করিলে নীতিজ্ঞানের বালাই থাকে না। নীতি-জ্ঞানহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম ভক্তির উদয় নাও ঘটাইতে পারে। অজ্ঞান অবস্থায় কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মেরও নীতিবিগর্হিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে অজ্ঞানের কর্ম্মে জ্ঞানোদয় নাও হইতে পারে। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপরে একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে।

সুতরাং তোমরা একাধারে জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত হইবার চেষ্টা কর। ইহাই অখণ্ডের অখণ্ডত্ব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

বাটানগর

৯ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি লইয়া বাদ-বিসম্বাদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। একটী বৃন্তে তিনটী ফুল ফোটা কি অসম্ভব? অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, একটী ফুলেই তিনটী তিন রঙ্গের পাপড়ী হওয়া কি অসম্ভব? অথবা এক-পাপড়ীর একটী ফুলেই তিনটী অবস্থা কি অসম্ভব? আমেরিকার লুথার বারবাঙ্ক দুই তিনটী ফলের বিশেষত্ব একটী ফলে সমাবিষ্ট করিয়া নূতন নূতন ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতের ধর্ম্ম-জগতে কি জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় সাধনের বারবাঙ্ক কেহ হইতে পারে না? অতীতে তোমরা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি নিয়া অনেক কলহ করিয়াছ। ইহাই যথেষ্ট যুক্তি নহে যে এই তিনটীর সুষম সমাবেশ সম্ভব নহে। অতীতে কলহের তিক্ততায় ধর্ম্মজগৎকে বিষাক্ত করিয়াছ বলিয়াই ত বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহাতে নিষ্কলহ সমন্বয়ের পূর্ণানন্দে কাটিতে পারে, তাহার পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। বিশ্বাস করিও, সেই পথ আবিষ্কৃতও হইয়াছে।

একটী আম্রফলে সবগুলি রসই বিদ্যমান। শৈশবে তাহাতে কষায় রসের আধিক্য, কৈশোরে তাহাতে অম্লরসের সঞ্চার, যৌবনে তাহাতে অম্লরসের আত্যাধিক্য, পূর্ণতায় ও পরিপক্কতায় তাহাতে মধুররসের সমারোহ। যখন যেই রসটীই প্রধান হউক, সঙ্গে সঙ্গে অপর রসগুলিও

বর্তমান থাকিতেছে। কখনো কখনো একটী রস অন্যতর রসে রূপান্তরিত হইতেছে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্তটী গ্রহণীয়। আজ যাহা জ্ঞান, কাল তাহা ভক্তি, আজ যাহা পরমরমণীয় ভক্তি, কাল তাহা অবিচল সুস্থির জ্ঞান, আজ যাহা জ্ঞান, কাল তাহা অভ্রান্ত অপ্রমাদ কর্ম্ম, আজ যাহা কর্ম্ম, কাল তাহা অমৃতসরসা ভক্তি বা বিদ্যুদুজ্জ্বল জ্ঞান। একটী অনুক্ষণ আর একটীতে রূপান্তর পাইতেছে। একটীকে আর একটী হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার উপায় নাই। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর জলকে ততক্ষণই পৃথক করিয়া দেখার বা রাখার উপায় আছে, যতক্ষণ তাহারা ত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া না পৌছিতেছে। পৌছিয়া গেলে আর তাহাদিগকে আলাদা করিয়া চিনিবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই।

তথাপি যে আমরা ইহাদিগকে আলাদা করিয়া মার্কা মারিতে চেষ্টা করি, তাহার কারণ, আমাদের সাম্প্রদায়িক গরিমা রক্ষার আগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ এবং নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গৌরব-বোধ দোষের কথা নহে। ইহারও প্রয়োজন আছে। যার সম্প্রদায় যেরূপেরই হউক না কেন, ইহার সম্পর্কে অসাধারণ গৌরববোধ করিবার মত যোগ্য কারণ এবং উপকারণ সততই থাকে। এই গৌরববোধ সাধককে নিজ সম্প্রদায়ে অনুশীলিত ও সুপ্রশংসিত সদাচারগুলি হইতে বিভ্রষ্ট হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই, এই গৌরববোধ সাধকের পক্ষে হিতকর। এই গৌরববোধ সমাজের পক্ষে তখনই অহিতকর, যখন ইহা অপর মতের ও অপর পথের সাধকদের নিন্দায় ও গর্হণে প্রযুক্ত হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে নিন্দার সঙ্গত কারণও কিছু নাই। জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তি ইহাদের মধ্যে যেইটীকে কেহ যখন নিজের প্রধান বা একমাত্র উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করে, তখন ইহারা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। লক্ষ্য ইহাদের উর্দ্ধে, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ইহাদের রাজ্যের অনেকানেক দূরে। সেই লক্ষ্যে যখন পৌছান যায়, তখন ইহা নদোত্তীর্ণ নাবিকের পায়ের ঠেলায় দূরে সরিয়া যায়।

ভগবানকে যে যেমন করিয়াই বুঝুক বা বর্ণনা করুক, তাঁর কাছে নিয়া নিজেকে পৌছানই প্রতিজনের লক্ষ্য। কেহ এমন করিয়া বুঝিয়াছে, যাহাতে কর্ম্মের বাহন ছাড়া অগ্রগতি তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ বা এমন করিয়া বুঝিয়াছে, যাহাতে জ্ঞানের বাহন ছাড়া তাহার গতিবেগ রক্ষা অসম্ভব। কেহ বা এমন করিয়া বুঝিয়াছে, যাহাতে ভক্তির বাহন ছাড়া তাহার এক চুল আগাইবার উপায় নাই। ভগবানকে এমন করিয়াও বুঝা সম্ভব, যাহাতে একটী রথেই জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেমকে জুড়িয়া লইয়া অগ্রসর হওয়া যায়। বাস্তবে ইহা অসম্ভব নহে বলিয়াই কল্পনায় ইহা সম্ভব বলিয়া আমার নিকটে প্রতিভাত হইয়াছে। আবার, কল্পনায় ইহা সম্ভব বলিয়া অনুভব করার দরুণে বাস্তবে ইহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইতে আমি সাহসী হইয়াছি। এই উপলব্ধি আমি পাই নাই, কেবল কথার পর কথাই বলিয়া যাইতেছি, এমন মনে করিও না। হরিদ্রা, লাল ও নীল এই তিনটী রং যেমন মিলিতে পারে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটী পথ তেমন মিলিতে পারে।

সুতরাং কেহ ইহাদের মধ্যে আলাদা করিয়া নির্দ্দিষ্ট একটী মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকিলে আমি তাহাকে নিন্দা করিব কোন্ দুঃখে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

বাটানগর

৯ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি বা তুমি আশ্রমে বাস করিতেছি বা ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন গ্রহণ করিয়াছি, ইহাই আমাদের নৈতিক অধোগতি নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট গ্যারাণ্টি নহে। আমি বা তুমি নিয়ত নিজেকে শুদ্ধ, পবিত্র, অপাপবিদ্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি,—ইহারও প্রয়োজন। আশ্রমবাসী হইয়াছি ত জগদুদ্ধার করিয়া দিয়াছি, আমরা সাধারণ গৃহস্থ মানুষদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া গিয়াছি, আমাদের উচ্চতার আর নাগাল পায় কে,—এই জাতীয় উচ্চমন্যতা হীনতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণ গৃহস্থেরা যেরূপ কাজ করিলে নিন্দনীয় হইয়া থাকে, যেরূপ ব্যাপারে শিথিলদৃষ্টি হইলে অধঃপাতে যায়, সেরূপ কাজ বা দৃষ্টিশৈথিল্য আমাদের পক্ষেও বর্জ্জনীয়। আমরা আশ্রমবাসী হইয়াছি বলিয়া আমাদের জন্য নীতিশাস্ত্রের ও সদাচারের টীকা-ভাষ্য নূতন রকমের হইবে, ইহা প্রত্যাশা করা উচিত নহে।

একজন গুরুদেব বা ধর্ম্মপ্রচারক সাধারণ মানুষের চাইতে চতুর বা চালাক হইতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য নৈতিক সদাচার লঙ্ঘনের অধিকার তাঁহার জন্মে না। যে কাজ তাঁহার একজন শিষ্য বা অনুবর্ত্তীর পক্ষে পাপ, সে কাজ তাঁহার নিজের পক্ষে দিব্যাচার বা লীলা বলিয়া ব্যাখ্যাত হওয়া অন্যায়। নীতিজ্ঞানের মর্য্যাদা সাধারণ ও অসাধারণ সকল লোককেই রাখিতে হইবে। না রাখিলে সে বা তিনি পথভ্রষ্ট ও পতিত হইবেন। পতিত ব্যক্তি গুরুদেব বা মঠাধ্যক্ষ বলিয়াই তাঁহার কুকার্য্য সব ঐশ্বরিকী লীলা আর সাধারণ লোকের কুকার্য্য-সমূহ নরকপ্রদ দুঃশীলতা,—নীতিজ্ঞানের এই দ্বৈতমত চলিবে না। অতএব লোক-ব্যবহারে ও গুপ্তাচারে তোমাকে, আমাকে এবং সকলকে নিজ নিজ শুদ্ধ বিবেকের নিকটে নিষ্পাপ, নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিতে হইবে।

এই কথাটী তোমরা প্রতি জনে মনে রাখিও। এই দুর্ভাগা দেশে অবতার-বাদ এমন সহজে প্রতিষ্ঠিত যে, একবার কাহাকেও অবতার বলিয়া প্রচার করিতে পারিলে তিনি অবাধে অতীব নিন্দনীয় কাজ সমূহ সগর্ব্বে করিয়া যাইতে সমর্থ হন, ভেড়ার পাল প্রতিবাদ না করিয়া সোল্লাসে প্রচার করে—"ইহা আমাদের প্রভুর অপার লীলা।" এই সকল অবতারেরা অমর নহেন, ইঁহাদের সম্প্রদায়ও চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু দেশের মাটির স্বাভাবিক ধাতে আরও কত কত অবতারেরা আবির্ভূত হইবেন এবং পূজিত হইবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, লৌকিক সদাচারকে লঙ্ঘন করিবার অধিকার তাঁহাদেরও নাই। ধর্ম্মোন্মাদনা অনাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মবোধ নীতি-জ্ঞানের সহিত বিরোধ কদাচ করিবে না। পাপ সকলের পক্ষেই পাপ,

সকলের পক্ষেই বর্জ্জনীয়, সকল যুগেই নিন্দনীয়। একজন সাধারণ লোক দুইটী বিবাহ করিলে নিন্দনীয় হইবে, বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আসিয়া আন্দোলন করিতে হইবে আর ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষেরা কেহ আটটী, কেহ দশটী, কেহ ষোলটী বিবাহ করিয়া লীলাধর পুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত হইবেন, ইহা ন্যায়বিচার নহে। কোথাও যুক্তি দেখান হইবে, পুত্রসন্তান হইল না বলিয়া ইনি এতগুলি বিবাহ করিয়াছেন, কোথাও বা যুক্তি দেখান হইবে, উৎকৃষ্ট জাতির মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য ইনি "ব্রিডিং বুল"এর কাজ করিয়াছেন,—এসব যুক্তি সঙ্গতও নহে, গ্রহণীয়ও নহে।

একজন সাধারণ লোক পকেট কাটিয়া তোমার রুমাল হইতে দুইটী টাকা নিলে সে রাস্তার হাজার লোকের কিল খাইয়া মরিবে আর একজন ঈশ্বরতুল্য লোক একজনকে দুই লক্ষ টাকা ঠকাইলে এই কার্য্য লীলা বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইবে, ইহার মধ্যে কোথাও এককণা সুবিচার নাই জানিও। যে ব্যক্তি লোককে একটী পয়সাও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠকায়, সেও যেমন চোর, যিনি লোককে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোটি মুদ্রা ঠকাইয়াও ধরা পড়েন না বা পড়িলেও অব্যাহতি পান, তিনিও তেমন চোর। চোরেরা জগতের পূজা পাইবে, ইহা অবিচার।

লোভ এবং কামের অধীন হইয়া দুর্ব্বলচেতা মহাপুরুষেরা কেবল পরের বা সমাজেরই অনিষ্ট করেন না, নিজেদেরও অনিষ্ট করেন। লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা সহর গুলজার করিতে পারেন, কিন্তু বিবেকের দংশন হইতে কি তাঁহারা মুক্তি পান? পর-

নারী স্পর্শ মাত্রও না করিয়া দণ্ডিত হইয়াছেন, এমন মহাপুরুষ কেহ কেহ আছেন। স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, উহা ধূর্ত্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রেরই ফল। কিন্তু বহু সতীর সতীত্বে আঘাত করিয়া, বহু নারীকে চূড়ান্ত অসম্মান করিয়া, বহু রমণীকে বিপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াও জগতের বুকে বীরদর্পে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন মহাপুরুষেরও অভাব নাই। বাহিরে শিষ্য-দল জগঝম্প বাজাইয়া তাঁহাদের অবতারত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু ভিতরে বিষ্ঠার কীটগুলি তাঁহাদের অন্তরে কিলিবিলি করিয়া পেটে নাড়ি-ভূঁড়িতে কেবল নিত্য নূতন শয়তানীর ডিম্ব প্রসব করিতেছে। লোকেরা সেকথা জানিতে পারে নাই বা জানিয়া থাকিলেও সেগুলি প্রভুর লীলা বলিয়া ব্যাখ্যাতারা উড়াইয়া দিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা যে নিজেদের কাছে নিজেরা স্বচ্ছ, সুন্দর ও প্রশংসিত রহিয়াছেন, ইহা মনে করা ভুল। ইঁহাদের অধঃপতন ও বিবেকের অবশ্যম্ভাবী বৃশ্চিক-দংশনের কথা চিন্তা করিয়া তোমরা প্রত্যেকে হুঁশিয়ার হইয়া যাইও। অপরে কে কোথাও তোমাদিগকে নিন্দা বা প্রশংসা করিল, ভাবিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। নিজেদের কাছে নিজেরা যেন কদাচ ছোট না হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

বাটানগর
৯ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ক্ষুদ্র কাজও সকলে মিলিয়া করিলে তাহার মধ্যে উৎসবের আনন্দ পাওয়া যায়। মিলনটাই একটা উৎসব, উপলক্ষ্যটা যত ছোটই হউক। তোমাদের জীবন চির-উৎসবময় হউক। ইহার মধ্য দিয়া নিখিল-ভুবনের মিলন-মন্ত্র সাধন করা হইবে।

অভিমানে দূরে সরিয়া গিয়া নহে, সেবাবুদ্ধিতে সকলে সকলের সহিত মিলিত হইয়াই শক্তি অর্জ্জন করিবে। জয় শক্তিমানেরই হইবে, দুর্ব্বলের নহে। যাহারা মিলিতে পারিয়াছে, শক্তিমান তাহারাই হইবে।

অকপট সেবা এবং তজ্জনিত আত্মপ্রসাদই জীবনের স্থায়ী সম্পদ। কেহই নেতা হইয়া জন্মে না, সেবা দ্বারা নেতৃত্ব লাভ হয়। নেতৃত্ব করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নহে, সেবাদানেই জীবনের চরম চরিতার্থতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

বাটানগর
১০ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজেদের মধ্যে আত্মকলহের ভাব থাকিলে কোনও সংগঠনের কাজ অগ্রগতি পায় না। অতএব মান-অভিমানের তুচ্ছ বিচার পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়া কি ভাবে সকলের শক্তি একই সময়ে একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রয়োগ করা যায়, তোমরা প্রতিজনে সেই দিকে মন দাও।

পরস্পর পরস্পরকে ভয় করা বা অবিশ্বাস করা বিশেষ ক্ষতিকর ব্যাপার। কারণ সহ এই দুইটী জিনিষকে সঙ্ঘ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে।

অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প ভালভাবে চলিলে ক্ষেত্রনির্ম্মাণের কাজ অত্যুত্তম হয়। কথাটী প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিও এবং কাজটী ভালভাবে চালু রাখিও।

এবার ত্রিপুরা-ভ্রমণ বাতিল করিতে বাধ্য হইয়া আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিন্তু ভ্রমণ-তালিকা পুনরায় যে-কোনও সময়ে হইতে পারে। তারিখ অনিশ্চিত এবং ভ্রমণ সুনিশ্চিত জানিয়া তোমরা কাজ করিয়া যাইতে থাক। যে-কোনও সময়ে যে-কোনও স্থানে আমার ভ্রমণ-তালিকা হঠাৎ হইয়া যাইতে পারে। আজ যেখানে যাইতেছি, কাল সেখান হইতে দুই হাজার মাইল দূরে যাইতে পারি। ভ্রমণ-তালিকা আমি দেশ দেখিবার জন্য করি না, প্রত্যহ খিচুড়ী খাইতে পাইব, এই লোভেও নহে। যেখানে সত্যই আমাকে দিয়া তোমাদের প্রয়োজন, কেন সেখানে যাইব না?

গুরুতে নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিরা সঙ্ঘের কার্য্য-ভার পাইলে বিভীষণের
অভিনয় করে। বহুজনকে বারংবার ক্ষমা করিয়া কার্য্যভার দিয়া এই
বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। সুতরাং যাকে তাকে জরুরী কাজের
ভার দিবে না। আমি গুরুরূপে তোমাদের পূজা চাহি না। তথাপি
যদি দেখিতে পাও যে কেহ এমন উক্তি করিতেছে, যাহার সহিত আমার
আচরণের সম্পর্ক নাই এবং যাহা অপরের নিষ্ঠাহানিকর ও অন্তরের শ্রদ্ধা-
নাশক, তাহা হইলে তাহাকে উপেক্ষা দ্বারা সম্মানিত করিবে।

প্রত্যেক মণ্ডলীতে এই পত্রখানা পাঠ করিয়া প্রতিজনকে শুনাইবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

কলিকাতা

হরিওঁ

১১ই ফাল্গুন, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে কাজই কর, ভাবিয়া চিন্তিয়া করিও। এই বয়সে বিপত্নীক
হইলে অনেকে পুনরায় আর বিবাহ করে না, চিত্তের দুর্নিবার কামনা-
বাসনাকে দমিত করিয়া সর্ব্বশক্তি রূপান্তরে প্রকাশ করে জগৎকল্যাণ-
কার্য্যে বা জীবসেবার মধ্য দিয়া। অনেকে পরমেশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ
করিয়া রিপুর তাড়না হইতে দেহ-মনকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করে এবং

সফলও হয়। তোমার পক্ষেও সেই আচরণ, সেই কর্ম্মপন্থা, সেই কৌশল অবলম্বনীয় না হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

বলিবে, অন্তরের ভোগেচ্ছাকে দমন রাখি কি করিয়া। এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তাবলীর মধ্য দিয়া অনায়াসে পাইতে পার। চতুর্দিকে হাজার হাজার হিন্দু বিধবা-নারীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ইহাদের অধিকাংশই নিজ নিজ চরিত্রগত শুদ্ধতা এবং আত্মসংযমের ক্ষমতার জন্য আমাদের পূজনীয়া। যদিও ইহাদের বৈধব্য-ব্রত-পালন প্রথা হিসাবে চলিতেছে, ইচ্ছা করিলেও এই প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বিবাহিত হওয়া সহজ কথা নহে, তথাপি ইহাদের বৈধব্য-পালন কেবল প্রথারই দাসত্ব নহে, ইহার মধ্যে আদর্শগত উদ্দীপনার স্থান অতীব উচ্চে। কেহ কেহ দিগ্‌ভ্রান্তা হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অধিকাংশেই অতীব পবিত্র সৎ জীবন যাপন করিয়া যাইতেছেন।

তুমি বা তোমার মতন অন্যান্য বিপত্নীকেরা ইহা হইতে কেন প্রেরণা সংগ্রহ করিবে না?

তোমাকে যদি পুনরায় বিবাহ করিতেই হয়, তবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া কার্য্যটী করিও। যে মেয়েটিকে বিবাহ করিবে, তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার দায়িত্ব নিতে হইবে। তাহাকে ক্ষুধার ক্লেশে আর প্রয়োজনীয় বস্ত্রাবরণাদির অভাবে পতিত হইতে না হয়, ইহার দায়িত্ব তোমার। বুদ্ধি-বিভ্রমে তুমি তোমার প্রথমা পত্নীকে সাংসারিক সুখ দিতে পার নাই। নিয়ত অভাব-অনটনের মধ্যে থাকিয়া কঠিন রোগে ভুগিয়া সে গতাসু হইয়াছে, তাহার সুচিকিৎসাও করিতে পার নাই। পুনরায় আর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে ঐ কষ্ট-

গুলি তুমি দিতে পার না। সুতরাং তোমাকে এমন ভাবে চলিতে হইবে যেন, তোমার নির্দ্দিষ্ট আয়টুকুই সংসারকে স্বচ্ছন্দ রাখে।

অপর দিকে, আগের সংসারের পুত্র-কন্যাদের প্রতিও তোমাকে সম্পূর্ণ স্নেহবান্ থাকিতে হইবে। পুত্রকন্যাদিগকে নূতন মা আনিয়া দিয়া মাতৃস্নেহের স্বাদ তাহাদিগকে পাওয়াইতে হইবে। মাতৃবিয়োগ-দুঃখের পর, তাহারা যদি পুনরায় বিমাতার বিদ্বেষ ও হিংসার লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়ে, তবে তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক এবং অধিকন্তর শোকাবহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। তোমার যদি শক্ত মেরুদণ্ড না থাকে, তাহা হইলে বিমাতার অকারণ রোষ হইতে পুত্রকন্যাগুলিকে বাঁচাইতে পারিবে না। নব-পরিণীতা পত্নীর প্রতি প্রেমবান্ হইয়াও আগের সংসারের পুত্রকন্যাগুলির প্রতি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ দরদী এবং ন্যায়-পরায়ণ হইতে হইবে। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর হাতে পড়িয়া অনেক বীর্য্যবান্ পুরুষ-সিংহকে একেবারে ভেড়ার বাচ্চা হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। তোমাকেও যদি তাহাই হইতে হয়, তাহা হইলে তুমি জীবনে যে ভুল করিবে, উহা সংশোধনের অতীত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করাই বড় কথা নহে, বিবাহ করিয়া সকলের শান্তি-বিধান করা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"**, প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **"কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য-পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

পত্র লিখিলেই মূল্য-তালিকা পাঠান হয়।

অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী